অগ্নিযুগের আগ্নেয়াস্ত্র

শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

প্রকাশক :
অনুশীলন সমিতির পক্ষে
শ্রীদীনেশচন্দ্র ঘটক
অনুশীলন ভবন
কুদঘাট, কলিকাতা-৪০

প্রথম সংস্করণ : ১লা বৈশাখ ১৩৬৭

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শ্রীশুচিব্রত দেব

মুদ্রাকর :
এককড়ি ভড়
নিউ শক্তি প্রেস
১০, রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রাপ্তিস্থান

খাদি প্রতিষ্ঠান
১৫ কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০৭৩

অনুশীলন ভবন
কুঁদ ঘাট
কলিকাতা-৭০০০৪০

ভূমিকা

আমরা যারা সশস্ত্র বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা চেয়েছিলাম তারা আগ্নেয়াস্ত্রকে উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম। সেদিন আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া আমাদের উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্য অন্য কোন পথ খুঁজে পাইনি। বোমা, পিস্তল, রিভলবার প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োগগত সার্থকতা অভিব্যক্ত হয়েছে বিভিন্ন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে; আর এই সব আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টাও বৈপ্লবিক কর্মকুশলতার সুস্পষ্ট পরিচয়। এই সকল দিক দিয়ে বিচার করলে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অগ্নিযুগের আগ্নেয়াস্ত্রের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। অগ্নিযুগ সম্পর্কে বহু বিষয় আলোচিত হলেও আগ্নেয়াস্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন কেউ করেছেন কিনা তা আমার জানা নেই। আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনার প্রথম পদক্ষেপের সাধু প্রচেষ্টার জন্য লেখককে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। লেখক আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু; কৈশোর বয়স হতে তিনি ময়মনসিংহ শহরের অনুশীলন সমিতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গবেষণা-লব্ধ গ্রন্থ জনপ্রিয় হবে বলে আমার আশা। নানা নথিপত্র ও সরকারী কাগজপত্র থেকে এবং জীবিত বিপ্লবীদের কাছ থেকে এই গবেষণা গ্রন্থের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বলে প্রামাণ্য হিসাবেও গ্রন্থখানি সমাদৃত হবে বলে আমার ধারণা। এই পুস্তকে প্রদত্ত তিন ধরনের বোমার চিত্র আমার নির্দেশে অঙ্কিত হয়েছে। আমি লেখকের এই সাধু প্রয়াসকে পুনরায় আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। ইতি—

শ্রীগণেশ ঘোষ

ভূমিকা লিখে দিয়ে তিনি শুধু এর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেননি, পরন্তু এই নব প্রচেষ্টাকে অলংকৃত করে জনমানসের সামনে একে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন। এই পুস্তকের জন্য অগ্নিযুগের বোমা ও পিস্তল সম্পর্কে তাঁর রচিত বিশেষ নিবন্ধ দু-টি নিঃসংশয়ে গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। তথ্য সংগ্রহ সম্পর্কে উপদেশ প্রদান এবং উৎসাহ বর্ধন ব্যতীত বোমার চিত্রাঙ্কনে তাঁর নির্দেশ অমূল্য। নানা দিক্ দিয়ে আমি তাঁর কাছে চিরঋণী।

কলকাতা হাইকোর্ট থেকে কিছু কিছু মূল্যবান্ তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র ও আদিম বিভাগের রেজিষ্ট্রার শ্রীশোভেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁদের সহায়তা ও মহানুভবতা আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার যাত্রাপথের প্রধান পাথেয়।

এছাড়া উৎসাহ পেয়েছি বহু বিপ্লবী বন্ধুর কাছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীজীবনতারা হালদার, শ্রদ্ধেয় শ্রীনিকুঞ্জ সেন, বন্ধুবর শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা, শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত, শ্রীমাখনলাল দত্ত, শ্রীসত্যরঞ্জন ঘটক, শ্রীঅর্ধেন্দু গুহ, শ্রীকালিকিঙ্কর দে প্রভৃতি।

এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, কলিকাতা (মাধ্যমিক) অধ্যাপক ডাঃ অমলেন্দু দে, শ্রীঅনিলবরণ নায়ক, সহ পরিদর্শক শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্তী ও শ্রীপ্রসাদমোহন মেদ্দা, এবং বহু শিক্ষক সহকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রেরণা এবং উৎসাহ না পেলে হয়ত এই রচনার দুঃসাহসী পদক্ষেপে সাহস করতাম না। গ্রন্থ সংগ্রহ বিষয়ে জাতীয় গ্রন্থাগারের (National Library) কর্তৃপক্ষ এবং বন্ধুবর শ্রীবিনয়ভূষণ চক্রবর্তীর সাহায্যের জন্যও আমি কৃতজ্ঞ। পরিশেষে প্রচ্ছদ শিল্পের জন্য শ্রীশুচিব্রত দেবকে এবং তিন ধরনের বোমার চিত্রাঙ্কনের জন্য আমার অনুজপ্রতিম সহকর্মী, সাউথ সুবার্বণ ব্রাঞ্চ স্কুলের শিক্ষক শ্রীমান সলিল সেনগুপ্তকে আন্তরিক

প্রীতিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। গ্রন্থের অলংকরণে এঁদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অবদান আমার স্মৃতি ভাণ্ডারের অক্ষয় সঞ্চয়।

এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহের উৎস: নানা পুস্তক পুস্তিকা, পত্র পত্রিকা, সরকারী কাগজ পত্র, প্রতিবেদন, বিভিন্ন সরকারী কমিটির রিপোর্ট এবং নানা মামলা মোকদ্দমার নথিপত্র। এ সমস্ত উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে না পারলে গ্রন্থ রচনা হয়ত আমার পক্ষে সম্ভব হোত না।

মুখবন্ধের সাধারণতঃ দু-টি দিক থাকে; একটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিক; অন্যটি গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য উপস্থাপনার দিক।

অগ্নিযুগে বিপ্লবীরা কোন্ কোন্ ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছেন সে সম্পর্কে ঘটনার কালানুক্রমিকতা যথাসম্ভব রক্ষা করার চেষ্টা করলেও এই গ্রন্থে ঘটনা বিন্যাস করা হয়েছে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বোমা, পিস্তল ও রিভলবারের বিষয়ানুক্রমিকতার ভিত্তিতে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললে এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে হয়ত ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা বিভিন্ন সঙ্ঘর্ষে, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে ও ডাকাতিতে বোমা, পিস্তল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন; তাঁদের উদ্দেশ্য কি ছিল? এখনকার মত বোমা তৈরি ও পিস্তল সংগ্রহ তখন সহজ সাধ্য ছিল না; তখন যত্রতত্র সামান্য কারণে পেটো (বোমা), চেম্বার (রিভলবার) ও পাইপগান ব্যবহৃত হোত না। পাড়ায় পাড়ায় গোষ্ঠীগত ঝগড়া ও ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করার জন্য তখন দেশের কাজে নিবেদিত প্রাণ বিপ্লবীরা বোমা বা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যথেচ্ছাচারিতা করতেন না।

বিপ্লবীরা কি কি কারণে রাজনৈতিক হত্যা ও রাজনৈতিক ডাকাতি করতেন, সে সম্পর্কে আমার স্বল্পজ্ঞানলব্ধ মন্তব্যের পরিবর্তে বিপ্লব তাপস মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর মন্তব্য পরিবেশন

করছি। এ থেকে অগ্নিযুগের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও ডাকাতি কি উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হোত তা পরিস্ফুট হয়েছে।

খুন

বিপ্লবীরা অপরাধীর শাস্তি বিধান করিয়াছে। যাহারা বিপ্লব প্রচেষ্টার পথের কণ্টক তাহাদের অপসারণের ব্যবস্থা করিয়াছে। যদি কোন বিচারক অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেন, তবে তিনি সেজন্য দায়ী হন না, বা জেলখানায় যাহারা অপরাধীকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলায়, তাহারাও সে জন্য দায়ী হয় না, দায়ী সে নিজে, তাহার কৃত কর্মের জন্য। বিপ্লবীরা তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের মতে ইংরেজদের ভারতের উপর প্রভুত্ব করার কোন অধিকার নাই। এই স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরেজ শাসকের সহায়ক যাহারা, তাহারা দেশের শত্রু, জাতির শত্রু। যাহারা শত্রুর সহায়ক তাহারাও অপরাধী। যাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই বিপ্লবী কর্মীদিগের উপর অত্যাচারের বা বিপ্লবী দলের ক্ষতি সাধন করার একটা ইতিহাস আছে। বিপ্লবীরা ব্যক্তিগত বিদ্বেষবশতঃ কাহাকেও হত্যা করে নাই, করা সম্ভবও ছিল না, কারণ এইরূপ দণ্ড-দানের চূড়ান্ত নির্দেশ দিতেন বিচার বিবেচনা করিয়া নেতৃস্থানীয়গণ। দণ্ড দিবার ব্যবস্থা যেমন দেশীয় পুলিস ও গুপ্তচরদের প্রতি নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তেমনি ইংরেজ কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। এছাড়া সাধারণের মধ্যে ভয় ভাঙ্গার প্রেরণার জন্যও এইরূপ দণ্ডদানের প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়াছে।” (১)

ডাকাতি

“যে কোন বাড়িতে ডাকাতি করা যাইত না। ডাকাতি করার সময় বাড়ি নির্বাচন পদ্ধতি ছিল, যাহারা দেশদ্রোহী, সরকারের খয়ের খাঁ, অত্যাচারী, কৃপণ, কোন সৎকাজে অর্থব্যয় করে না, এরূপ

ধনী ব্যক্তির গৃহে ডাকাতি করিতে হইবে। ডাকাতির সময় কেহ স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিতে পারিত না, কোন স্ত্রীলোকের দেহ হইতে অলঙ্কার ছিনাইয়া নিতে পারিত না। অবশ্য কাহারও দেহে অত্যধিক অলঙ্কার থাকিলে কিছু চাহিয়া নিতে পারিত, কিন্তু বল প্রয়োগ করিতে বা ভয় দেখাইতে পারিত না। শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তি-দিগের উপরও হাত উঠান নিষেধ ছিল।” (২)

বিপ্লবীরা রাজনৈতিক হত্যাকে যে লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেন নি, উপায়রূপে গ্রহণ করেছিলেন এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এ সম্পর্কে শহীদ ভগৎ সিং-এর উক্তিও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। বিপ্লবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর উক্তি ঃ

“Revolution does not necessarily involve sanguinary strife nor is there any place in it for an individual vendeatta. It is not the cult of the bomb and the pistol.”

তবু বিপ্লবীদের বোমা ও পিস্তল ব্যবহার করতে হয়েছে। কেন? বিপ্লবায়োজন সার্থক করার উদ্দেশ্যে। এই বিপ্লব বলতে তাঁবা কি বুঝেছিলেন তা ভগৎ সিং-এর নিজের কথাতেই পরিস্ফুট হয়েছে ঃ

“By Revolution we mean that, the present order of things which are based on manifest injustice must change.”

পরিশেষে বিদগ্ধজনের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, অনবধানতাবশতঃ ভ্রমপ্রমাদ হওয়া বিচিত্র নয়; সে ত্রুটির জন্য আমি মার্জনা চাইছি। কোনও ত্রুটি প্রদর্শিত হলে বা সংযোজন যোগ্য কোনও তথ্য এবং অভিমত থাকলে পরবর্তী সংস্করণে তা সাদরে সংশোধিত, সংযোজিত ও বিবেচিত হবে। ইতি

শ্রীঅমলেন্দু বাগচী

উৎসর্গ

বাবা,

তোমার আশীর্বাদ নিয়ে আমার প্রথম প্রয়াস উৎসর্গ করছি সেই সব ছন্নছাড়া বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে যাঁরা—

"জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।" ইতি—

তোমার স্নেহের অমলেন্দু।

অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের ব্যবহৃত পিস্তল, রিভলবার

অগ্নিযুগের আগ্নেয়াস্ত্র

প্রথম অধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে এদেশের উচ্চ শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর এক অংশ নিয়ম তান্ত্রিক উপায়ে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে কিছুটা রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে প্রয়াসী হন। এঁরা হলেন নরমপন্থী আর এক দল নিরুপদ্রব প্রতিরোধ, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার, বিদেশী দ্রব্য বর্জন, অহিংস অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনের মাধ্যমে "স্বরাজ" অর্জনে প্রয়াসী হন। এঁরা চরমপন্থী বলে অভিহিত হতেন। এঁরা আবেদন নিবেদনের নীতিতেও যেমন বিশ্বাস করতেন না তেমন ব্রিটিশ বিতাড়ন বা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের ধারণাও পোষণ করতেন না।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রথম দিকে "স্বরাজ" সম্পর্কে ধারণা ছিল শুধুমাত্র "স্বায়ত্তশাসন" অর্জন। বহু সংগ্রামের পর পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গৃহীত হয়। স্বায়ত্তশাসন লাভের দাবি নিয়েই ১৯২৮ সালের নেহেরু রিপোর্ট রচিত হয়। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়,—১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট সুরু হয় বিয়াল্লিশের গণ-অভ্যুত্থান বা "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন। একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী বিপ্লবীরাই সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। লোকচক্ষুতে হেয় করার জন্য ইংরেজরা এঁদের বলত সন্ত্রাসবাদী। সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শাসকের অন্তরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করলেও জাতীয় ইতিহাসে এঁরা দেশপ্রেমিক আত্মনিবেদিত প্রাণ বিপ্লবী রূপে পূজিত। [নিয়মতান্ত্রিক আবেদন নিবেদন এবং নিরুপদ্রব অহিংস আন্দোলনে মোটেই বিশ্বাস করতেন না। এঁদের কাম্য

ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা; স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসন নয়।] বিপ্লবীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যতীত পূর্ণ স্বাধীনতা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। পূর্ববর্তীদের সাথে এঁদের মত ও পথের পার্থক্য ছিল বলেই অপরিহার্যভাবে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এঁরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেন।

বিপ্লবীদের মতে হোমরুল আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতির দাবি যে কার্যতঃ নিরর্থক ১৯২২ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদকের কাছে লেখা মহানায়ক রাসবিহারী বসুর চিঠি থেকে তা পরিস্ফুট হয়। ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদককে লিখিত তাঁর পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ ঃ

["For India to desire to remain within the Empire is to acknowledge herself as a slave. Freedom and slavery can not go together. If India wants freedom, she must completely sever all connections with Britain, of course, she will be at liberty to conclude a friendly alliance with England but that should be done between equals, between two sovereign states. If she wants Home Rule or status of equal partnership within the Empire, it can not mean anything else than that she desires to perpetuate her selfhood."] (৩)

জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্লববাদের যুগই অগ্নিযুগ বলে অভিহিত হয়েছে। এই যুগে বিপ্লবীদের অন্তরে দেশাত্মবোধের দেদীপ্যমান অগ্নিশিখা পৌরুষহীনতার গ্লানি ও কলঙ্ক এবং আত্মবিস্মৃতির মোহ দূর করে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে স্বাধীনতার সমুজ্জ্বল আদর্শবোধ। বিপ্লবীরা বিশ্বাস করতেন বিদেশী শাসনে শৃঙ্খলিত কোনও জাতির স্বাধীন সত্তার বিকাশ ও আত্মপ্রকাশ অসম্ভব। তাঁরা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন পরাধীনতার জ্বালা, দাসত্বের বেদনা। নীতিবাক্য, কথা ও বক্তৃতার ফুলঝুরি

তৈরিকে তাঁরা ভাব বিলাস বলে মনে করতেন। উদ্দেশ্যের বাস্তব রূপায়ণের জন্য যাত্রাপথের পাথেয় হিসাবে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন আগ্নেয়াস্ত্রকে। তাই অগ্নিযুগ আর আগ্নেয়াস্ত্র এ দুটির একটিকে ছেড়ে আর একটিকে কল্পনা করা যায় না। একটি বোমা বিস্ফোরণ বা একটি পিস্তলের গুলিবর্ষণ সামগ্রিক বিপ্লবের অগ্রগতির কতটা সহায়ক তার সঠিক বিচার করা সম্ভবপর না হলেও এরূপ বোমা বিস্ফোরণ ও গুলিবর্ষণ যে ভাবী বিপ্লবের ইঙ্গিতবহ সে কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। এদিক্ দিয়ে বিচার করলে অগ্নিযুগের অবদানের মূল্যায়নে আগ্নেয়াস্ত্রের ভূমিকা.যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বিপ্লবীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল; বিশেষতঃ তাঁদের ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে তথ্য আহরণ শুধু দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্য ছিল। স্বাধীনোত্তর যুগে নানা মামলা মোকদ্দমার বিবরণ, নথিপত্র, বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজ, গোপনীয় পুলিসী প্রতিবেদন ও জীবিত বিপ্লবীদের কাছ থেকে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে; তবুও আত্মপ্রচার বিমুখ বিপ্লবীদের সম্পর্কে বহু তথ্য এখনও জানার চেয়ে অজানা রয়েছে বেশী।

অগ্নিযুগে বিপ্লবীরা সাধারণতঃ কি কি ধরনের বোমা, পিস্তল বা অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতেন, কোন্ কোন্ ঘটনায় কোন্ কোন্ ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল, তাঁরা কিভাবে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতেন এবং এ সকল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের উৎস কি ছিল এ সকল বিষয় জানবার কৌতূহল অনেকেরই থাকা স্বাভাবিক।

অগ্নিযুগের বোমা ও বিস্ফোরক পদার্থ

অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের ব্যবহৃত নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তাঁদের অন্যতম প্রধান অস্ত্র বোমার এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

ছিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত "সন্ধ্যা" পত্রিকায় "কালী মাই কি বোমা" নামক প্রবন্ধে প্রকাশ্যভাবে বোমা তৈরি বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। নানা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে বোমা ব্যবহারের অজস্র প্রমাণ আছে।

সিডিসন কমিটির রিপোর্টে বিপ্লবীদের বোমার প্রকৃতি, কার্যকারিতা, শ্রেণীবিন্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুটা আলোক সম্পাত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে বিপ্লবীদের ব্যবহৃত নিম্নলিখিত ধরনের বোমার উল্লেখ আছে।

(১) Round Type—বা গোলাকার বোমা।

(২) Cocoanut Type—বা নারকেল খোলের বোমা।

প্রথম ধরনের বোমার পরিণতি হয় Spherical Type-এ বা বর্তুলাকার বোমায় এবং পরবর্তী কালে ঐ Spherical Type-এর পরিণতি ঘটে Cylindrical type-এ অর্থাৎ কতকটা লম্বাটে ধরনের বোমায়। এজন্যই অগ্নিযুগের শেষের দিকের বোমাগুলো ঠিক গোলাকার ছিল না, কতকটা লম্বাটে ধরনের ছিল।

পরবর্তীকালের কাষ্ট্ আয়রণের (Cast Iron) তৈরি পিকরিক এসিড্ ধরনের (Picric Acid Type) বোমা ছিল উন্নততর, অধিকতর শক্তিশালী ও মারাত্মক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯১৩ সাল থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীরা এই নূতন ধরনের অতি বিস্ফোরক মারাত্মক পিকরিক এসিড বোমা ব্যবহার করেন। (৪)

এর পূর্বে সিডিসন কমিটির রিপোর্টে উল্লিখিত দু'ধরনের বোমাই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হত।[1]

অগ্নিযুগের প্রথম দিকে রাজনৈতিক হত্যার উদ্দেশ্যে টিনের খোলের Round type ধরনের বোমাই ব্যবহৃত হত। অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী ছিল বলে রাজনৈতিক হত্যার উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ

নারকোল খোলের বোমা ব্যবহৃত হত না; শুধুমাত্র ভীতি প্রদর্শন ও বিপ্লবীদের অস্তিত্ব জ্ঞাপনের জন্য এ ধরনের বোমা ব্যবহৃত হত। পুলিসের ধারণা যে এই উদ্দেশ্যে আত্মোন্নতি সমিতির বিপ্লবীরা অগ্নিযুগের প্রথম দিকে এ ধরনের বোমা নিক্ষেপ করেছেন। (৫)

সিডিসন কমিটির রিপোর্টে বিপ্লবীদের ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কার্যকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তা আলোচনা করা হয়েছে। এ থেকে বিপ্লবীদের বোমা নিক্ষেপের মুখে কি উদ্দেশ্য ছিল তা পরিস্ফুট হয়েছে।

অগ্নিযুগের উন্মেষকালের ব্যবহৃত Round type ধরনের বোমা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত এই যে, এ ধরনের বোমাগুলি মোটামুটিভাবে মারাত্মক হলেও এদের ধ্বংসাত্মিকা শক্তি ও মারণ-ক্ষমতা পরবর্তী কালে খাঁজকাটা কাষ্ট আয়রণ খোলের ন্যায় ব্যাপকতর ছিল না। Round type ধরনের টিনের খোলের বোমার মারণ-শক্তি খুব স্বল্প ও সীমিত বলে বিস্ফোরণের ফলে নিক্ষিপ্ত এই শ্রেণীর বোমার খণ্ডাংশের (Splinters) মারণশক্তি ছিল খুবই কম। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে আঘাত করে বিস্ফোরণ ঘটাতে না পারলে অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের বোমার ফলাফল সুনিশ্চিত ছিলনা। সে যুগে সাধারণতঃ টিনের খোলের বোমা ব্যবহৃত হলেও তামা, পিতল প্রভৃতি ধাতু নির্মিত খোলও যে ব্যবহৃত হত, তা আলিপুর বোমার মামলার বিভিন্ন একজিবিটে (Exhibit) জানা যায়; তবে প্রথমদিকে যে ছাঁচে ঢালা-লোহার (Cast Iron) খোলের খাঁজকাটা বোমা ব্যবহৃত হয় নি, তা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

১৯০৯ সালের পর থেকে রাজনৈতিক হত্যার উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ অতি বিস্ফোরক (Highly Explosive) ধরনের বোমাই ব্যবহৃত হত। এই বোমাগুলোর অধিকাংশই চন্দননগর কিংবা রাজাবাজার কেন্দ্রের তৈরী। এ ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় বিপ্লবী কর্মিগণও কিছু কিছু বোমা তৈরি করতেন বলে কোনও কোনও সূত্রে জানা

যায়। মুন্সীগঞ্জ বোমার মামলার নথিপত্র থেকে জানা যায় যে ঢাকা অনুশীলন সমিতির উদ্যোগে অনেকগুলো শক্তিশালী বোমা তৈরি হয়েছিল। এ দেশে বিস্ফোরক পদার্থ সম্পর্কীয় আইনে (Explosive Substance Act of 1908) যে কত লোক অভিযুক্ত হয়ে দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন তার ইয়ত্তা নাই। অগ্নিযুগের সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে ব্যাপকতরভাবে বোমা ও বিস্ফোরক পদার্থ তৈরির আয়োজন হয়েছিল তা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

অগ্নিযুগের সূচনায় বোমা তৈরির ইতিহাসে উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস কানুনগো, সুরেশচন্দ্র দত্ত, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, মনীন্দ্রনাথ নায়েক ও অমৃতলাল হাজরা ওরফে শশাঙ্ক হাজরার অবদান অপরিসীম। এছাড়া বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর এবং অনেক অখ্যাতনামা কর্মীরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। নানা সূত্র থেকে জানা যায় যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্বয়ং বোমা তৈরির সংকেত সূত্র (Formula) বলে দিয়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করতেন। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু অনুশীলন সমিতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বোমা ও বিস্ফোরক তৈরি বিষয়ে আচার্য বসু ও রসায়নের খ্যাতনামা অধ্যাপক লাডলি মিত্রের অবদান অপরিমেয়। এই তথ্যের সমর্থনে প্রবীণ বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় জীবনতারা হালদারের নিম্নলিখিত বিবরণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

প্রতিষ্ঠাতাদের সহকর্মী আর একজন উৎসাহী যুবক ছিলেন রসিকলাল দত্ত। তিনি রসায়ন শাস্ত্রের তীক্ষ্ণ মেধাবী ছাত্র। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট গবেষণা করতেন। তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। প্রত্যহ কলেজের ছুটির পর বিকালে তিনি নিজের বাড়িতে রসিক-লালকে নিয়ে ময়দানে হাওয়া খেতে যেতেন এবং সন্ধ্যার পর রসিক লালকে মাণিকতলায় বাড়িতে (সমিতির আখড়ার কাছে) পঁহুছিয়ে দিয়ে তিনি ইউনিভারসিটিতে ফিরে যেতেন।

রসিকলাল প্রতিবৎসর কালীপূজার জন্য খুব উন্নত ধরনের বাজী

তৈরি করতেন। দ্রুতগামী রকেট তৈয়ারীর জন্য তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ১৯০৭।০৮ নাগাদ একবার তিনি তাঁদের বসত বাড়ির দোতলায় একটি ঘরে বাজী তৈয়ারির সময় সঞ্চিত রাসায়নিক দ্রব্যের বিস্ফোরণ ঘটে, তজ্জন্য তাঁর ছোট ভাইয়ের প্রাণ বিয়োগ হয়। বস্তুতঃ, ঐ ছেলেটির শরীরের মাংস টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিকের দেওয়ালে আটকে যায়।

বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই বাজী তৈয়ারির আচরণে রসিকলাল বিপ্লবের প্রয়োজনে শক্তিশালী বোমা প্রস্তুত প্রণালী উদ্ভাবন করতেন ও তজ্জন্য অত্যাবশ্যকীয় মাল মশলা জোগাড় করতেন।

বাঙ্গলার বিপ্লবের সহিত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের যোগাযোগ ছিল —বিশ্বস্ত মহলের এরূপ ধারণা আছে। ইহার সমর্থনে আমি উপরি উক্ত ঘটনার উল্লেখ করলাম। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রসিকলালের দাদা মাণিকলাল সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। বলা বাহুল্য আমি রসিকলালের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলাম।

পরবর্তীকালে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু আমার বাল্যবন্ধু, সহপাঠী ও সহকর্মী—সমিতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। ১৯০৫ সাল থেকেই সভ্য হয়। ১৯০৯ সালে হিন্দু স্কুল থেকে একসঙ্গে এনট্রান্স পাস করে আমি স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হই ; সত্যেনদা প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়। আমাদের দুজনেরই বন্ধু জিতেন চক্রবর্তীও প্রেসিডেন্সিতে বিজ্ঞানের ছাত্র। তার কাছে শুনেছি বি. এস. সি. রসায়ন শাস্ত্র পড়বার সময় সত্যেন্দ্রনাথ বড় বড় বই থেকে "বিস্ফোরক ও বিস্ফোরণ" অধ্যায়টি আগ্রহ সহকারে পড়তো এবং এই নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতো।

অনুমান করা অন্যায় হবে না যে, সত্যেন্দ্রনাথও বিপ্লব কার্যের উপযোগী বোমা তৈরির জন্য সচেষ্ট ছিল। বিশেষতঃ সত্যেন্দ্রনাথ আচার্য জগদীশ বসুর প্রিয় ছাত্র ছিল। বিপ্লবে তাঁহার সমর্থন

সুবিদিত। সমিতির ঢাকা কেন্দ্রের পরিচালক পুলিনদাস মহাশয়ও আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁহাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন।

এই সূত্রে আর একজন কৃতি রাসায়নিকের নাম করা উচিত—লাডলি মোহন মিত্র, ছাত্রদের অতি প্রিয় অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর লেখা Intermediate chemistry ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত কলেজেই নির্ভরযোগ্য পাঠ্যপুস্তক। রসিকলালের ন্যায় তিনিও বোমা তৈরির হদিস দিতেন। আমি তাঁর হাতে অনেকদিন picric acid-এর দাগ দেখেছি। তাঁরা দুজনেই অন্তরঙ্গ বন্ধু। (৬)

মুরারিপুকুর বোমার মামলার পর চন্দননগর ও রাজাবাজার বোমা তৈরি ও সরবরাহের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিভিন্ন বিপ্লবী দল চন্দননগর থেকে প্রয়োজন মত বোমা সংগ্রহ করতেন ; কখনও কখনও চন্দননগরের তৈরি বোমা সরাসরি সরবরাহ না করে অনুশীলন সমিতির বাদুড়বাগান কেন্দ্রে প্রেরণ করা হত এবং সেখান থেকেই বোমা সরবরাহ করা হত।

সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ অনুসারে তাঁর পণ্ডিচেরী প্রস্থানের পর চন্দননগরের বোমা তৈরির ভার অর্পিত হয় শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত নামক শ্রীরামপুরের অধিবাসী রসায়ন শাস্ত্রের এম. এস. সি. (M. Sc.) ক্লাসে অধ্যয়নরত জনৈক ছাত্রের উপর। পরে তাঁকে সাহায্য করেন রসায়ন শাস্ত্রের অপর দু'জন কৃতী ছাত্র শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক ও শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ। পরবর্তীকালে অনুশীলন সমিতির অমৃতলাল হাজরা ওরফে শশাঙ্ক চন্দননগরের এই বোমা নির্মাণ কেন্দ্রে যোগদান করে উন্নততর বোমা তৈরির সহায়তা করেন। (৭)

অমৃতলাল হাজরা ওরফে শশাঙ্কের বোমা তৈরির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রবর্তক সঙ্ঘের শ্রীমতিলাল রায় মন্তব্য করেন :

"শশাঙ্ক ওরফে অমৃতলাল হাজরাকে পাইয়া এতদিন যে বোমা টিনের

কৌটায় পিক্‌রিক্‌ এসিড্‌ ভরিয়া তার জড়াইয়া ফসফরাস ক্যাপের সাহায্যে আততায়ীর প্রাণনাশের জন্য ব্যবস্থা করা হইতেছিল, অতঃপর তাহা কাষ্ট আয়রণে নির্মাণ করার সুযোগ হইল।

টিনে বিদীর্ণ হওয়ায় যে ফললাভ হইত, কাষ্ট আয়রণ বিস্ফোরক বস্তুর বিদারণে অতঃপর এই বোমার শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। এই কর্মের কৃতিত্ব একমাত্র শশাঙ্কেরই।" (৮)

ব্রিটিশ ভারত বহির্ভূত অঞ্চল ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে গোয়েন্দাদের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে বোমা তৈরি করা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল বলে চন্দননগরে বোমা প্রস্তুতির বিশেষ আয়োজন সুরু হয়। এই বোমা প্রস্তুতির আয়োজনে চন্দননগর নিবাসী বহু সংগ্রামীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা ছিল। মতিলাল রায়, মণীন্দ্রনাথ নায়েক, ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগরকালী ঘোষ, রাসবিহারী বসু প্রভৃতির গৃহ ছিল চন্দননগরের বোমা তৈরির অন্যতম কেন্দ্র। (৯)

চন্দননগরের তৈরি বোমা সম্পর্কে নিক্সন রিপোর্টের নিম্নলিখিত তথ্য বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

Bombs in Chandannagore: It was found that Chandannagore had become a factory for the manufacture of bombs. The bombs used in the following series of outrages were identically of the same type as that of the Dalhousie Square case and are believed to be the manufacture of the Chandannagore group of anarchists.

1. "Attempt to bomb, Abdar Rahman, Midnapore,—(12th December, 1912.
2. Attempt to bomb, Lord Hardinge 23rd December, 1912.
3. Maulavi Bazar bomb case—27 th March, 1913.
4. Lahore bomb case—17th May, 1913". (১০)

নিক্সন রিপোর্ট ও সিডিসন কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে,

চন্দননগর বস্তুতঃ বোমা তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছিল এবং চন্দননগরের তৈরি বোমা বিভিন্ন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়েছিল।

অনুশীলন সমিতির রাজাবাজার কেন্দ্রে তৈরি বোমাগুলো আগের অন্যান্য ধরনের বোমার চেয়ে ঢের বেশি শশক্তিশালী ছিল। পুলিস রেকর্ডে রাজাবাজার কেন্দ্রে তৈরি এ ধরনের বোমাকে অতি মারাত্মক রাজাবাজার শ্রেণীর বোমা বা "Rajabazar type bomb" বলে অভিহিত করা হয়েছে। রাজাবাজার শ্রেণীর বোমা সম্পর্কে সিডিসন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এ ধরনের বোমা "Supplanted the spherical bomb" এবং এ ধরনের বোমা "was used in later outrages throughout Bengal and in other provinces"—এ ধরনের বোমা বর্তুলাকার বোমার স্থান অধিকার করে এবং পরবর্তীকালে বাঙ্গলা দেশের সর্বত্র এবং অন্যান্য প্রদেশের বৈপ্লবিক কার্যকলাপে এ ধরনের বোমা ব্যবহৃত হয়।

কারো কারো মতে চন্দননগরে মারাত্মক বোমা তৈরি হত মণীন্দ্রনাথ নায়েকের তত্ত্বাবধানে। পরবর্তীকালে উন্নততর বোমার কাষ্ট আয়রণের (Cast Iron) খোল তৈরি করতেন অমৃতলাল হাজরা ওরফে শশাঙ্ক; আর বিস্ফোরক পদার্থের আনুপাতিক হার নির্ধারণ করে বোমার মশলা পুরতেন মণীন্দ্রনাথ নায়েক। কালক্রমে শশাঙ্ক বোমা তৈরিতে দক্ষ হয়ে উঠেন। সিডিসন কমিটির রিপোর্ট থেকে আরও জানা যায় যে শুধু কলকাতা নয়, লাহোর, দিল্লী, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে বা অ্যাকশনে এই রাজাবাজার শ্রেণীর বোমা সরবরাহ ও ব্যবহৃত হয়েছে। (১১)

নানা তথ্য থেকে জানা যায় যে মহানায়ক রাসবিহারী পাঞ্জাব, দিল্লী ও যুক্তপ্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশের) বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্য সাধারণতঃ চন্দননগর ও রাজাবাজার কেন্দ্র থেকে বোমা সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন। বেনারস ছিল তখন উত্তর

ভারতের বৈপ্লবিক কার্যকলাপের অন্যতম কর্মকেন্দ্র। পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গলা দেশ থেকে আনীত বোমার অন্যতম সরবরাহ কেন্দ্রও ছিল এই বেনারস। বাঙ্গলা দেশের তৈরি বোমার উপর মহানায়ক রাসবিহারীর এত অগাধ বিশ্বাস ছিল যে তিনি এক সময়ে পিংলেকে বলেছিলেন যে, ভারতব্যাপী আসন্ন বিপ্লবে বাঙ্গলা দেশ প্রচুর বোমার জোগান দেবে। এ থেকে ধারণা করা যায় যে বাংলা দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রচুর বোমা তৈরি হত। আসন্ন সর্বভারতীয় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে বাঙ্গলা দেশের বোমা যে এক শক্তিশালী হাতিয়ার এবং প্রয়োজনকালে সেখান থেকে যে যথেষ্ট পরিমাণে বোমা সররবরাহ সুনিশ্চিত সে সম্পর্কে রাসবিহারীর মনে কোন সংশয় ছিল না। সর্বভারতীয় সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টায় বাঙ্গলার বোমার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই রাসবিহারী, শচীন সান্যাল ও বিনায়ক রাও কাপলেকে বাঙ্গলা দেশ থেকে লাহোরে বোমা নিয়ে আসার ভার অর্পণ করেন। এ সম্পর্কে বারানসীর হরিশ্চন্দ্র ঘাটের আশ্রয় কেন্দ্রে রাসবিহারীর সভাপতিত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় যে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তা বেনারস ষড়যন্ত্র মামলার রায়ে উল্লেখ করা হয়েছ।

"In a house at Harish Chandra Ghat Beneras, an important meeting was held presided over by Rashbehari and attended by Sachin, Damodar, Pingle, Venayak Rao, Jumuna Das and Bibhuti ; When it was settled to have rebellion all over the country with Damodar as leader of Allahabad, Rash behari going to Lahore with Pingle and Sachin and Venayak would take bombs from Bengal to Lahore." (12)

এ থেকে জানা যায় যে সর্বভারতীয় বিপ্লব আয়োজন প্রচেষ্টায় বোমার খুব গুরুত্ব ছিল। বাঙ্গালী বিপ্লবীদের বোমা ছোড়া যে যথার্থ কাজ ভারতের বাইরেও তা স্বীকৃতি লাভ করেছিল। একটি ঘটনার

উল্লেখে এই তথ্য পরিস্ফুট হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ইস্তাম্বুলে বরকতুল্লা, তারকনাথ দাস প্রভৃতি ভারতীয় বিপ্লবীদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে এনভার পাশা মন্তব্য করেন, "বাঙ্গলায় যারা বোমা ছুড়ছে কাজ তারাই করছে।" (১৩)

বাঙ্গালী বিপ্লবীদের প্রথমাবধি ধারণা ছিল যে ছু'চারটি বিভলবার বা পিস্তল জাতীয় ছোটখাটো আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে বোমা তৈরি বিপ্লব আয়োজনের প্রস্তুতির পক্ষে অধিকতর কার্যকর। বন্দুক, পিস্তল, রিভলবার, রাইফেল প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হলেও বাঙ্গলা দেশে বিপ্লবীরা বোমাকেই সহজ ও শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। এই কারণেই একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে অগ্নিযুগের সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের নানা প্রচেষ্টা থাকলেও বোমা তৈরির দিকেই বাঙ্গালী বিপ্লবীদের ঝোঁকটা ছিল বেশী।

বোমা তৈরি বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের বিপ্লবীরা যতটা এগিয়েছিলেন, মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীরা ততটা এগুতে পারেন নি; তার কারণ এই যে মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীদের হয়ত বাঙ্গালী বিপ্লবীদের মত বোমা তৈরির কলা কৌশল জানতেন না বা এ বিষয়ে তাঁদের কারিগরি জ্ঞান কম ছিল; নয়তঃ তারা বোমার চেয়ে পিস্তল রিভলবার প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রের অধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন। বাসুদেব বলবন্ত ফাড্‌কের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় বোমা ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানা যায় নি। তিনি আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন; কিন্তু বোমা তৈরি ও বিস্ফোরক পদার্থ সংগ্রহ করেছিলেন এরূপ কোনও তথ্য এ পর্যন্ত জানা যায় নি; অবশ্য তখন বোমা তৈরির কোন চেষ্টাও হয় নি। বোমা তৈরি প্রথম সুরু হয় বাঙ্গলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময়। তখন ৩২ নং মুরারিপুকুর রোড্, ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেন, ৩৮।৪ রাজা নবকৃষ্ণ ও গোয়াবাগানের গৃহে উল্লাসকর দত্তের নিজস্ব ল্যাবোরেটারী

ছিল বাঙ্গলা দেশের বোমা তৈরির ও বিস্ফোরক পদার্থ সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রধান কেন্দ্র। শুধু বোমা তৈরি নয়, বোমার প্রয়োগ বিষয়েও বাঙ্গলা দেশই প্রথম পথিকৃৎ। মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীদের দ্বারা সঙ্ঘটিত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে বোমার ব্যবহার খুব কমই লক্ষ্য করা যায়; বরং পিস্তল বা রিভলবার প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োগ সমধিক; তবে মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীরা যে একেবারেই বোমা ব্যবহার করেন নি বা বোমা ব্যবহারের গুরুত্ব দেন নি, তা বলা চলে না। আমেদাবাদে বড়লাট লর্ড মিণ্টোর প্রতি বোমা নিক্ষেপ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই প্রসঙ্গে নাসিকে গণেশ দামোদর সাভার করের গৃহে মুরারিপুকুরের বাগান বাড়ীতে প্রাপ্ত "Bomb Manual"-এর অনুরূপ "Bomb Manual" প্রাপ্তির উল্লেখ করা যায়। নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাকসন সাহেবের হত্যার অন্যতম সাহায্যকারী এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত মারাঠা বিপ্লবী কৃষ্ণগোপাল কার্ভে বাঙ্গলা দেশ থেকে বোমা তৈরি শিখে এসে ছোট্ট একটা বোমার কারখানা খোলেন। সেখানে তিনি যে শুধু বোমা তৈরি করতেন তা নয়; বিশ্বস্ত বন্ধু বান্ধব এবং বিপ্লবী কর্মীদেরও বোমা তৈরি শেখাতেন। জ্যাকসন হত্যাকাণ্ডের অন্যতম সহায়তাকারী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত মারাঠা বিপ্লবী বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডে বোমা তৈরির উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক পদার্থ সংগ্রহ করে তাঁর তাঁত ঘরে রাখতেন বলে জানা যায়।

পাঞ্জাবে ও বাঙ্গলার অনেক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে রিভলবার পিস্তল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হলেও উভয় স্থানে বোমার গুরুত্ব কোন ক্রমেই শিথিল হয়নি; মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীদের সম্পর্কেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য।

পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে সাধারণতঃ পিস্তল বা রিভলবার জাতীয় আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করলেও পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বোমা নিক্ষেপ ও বিস্ফোরণের অজস্র ঘটনা বোমার গুরুত্ব সম্পর্কে পাঞ্জাবী বিপ্লবীদের সচেতনতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পাঞ্জাব, দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ (বর্তমানের উত্তর প্রদেশ) তথা সমগ্র উত্তর ভারতের বিপ্লবীদের বোমার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করার মূলে রয়েছে মহানায়ক রাসবিহারী, শচীন সান্যাল, যোগেশ চ্যাটার্জি, রাজেন লাহিড়ী, যতীনদাস প্রমুখ বাঙ্গালী বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণা ও সক্রিয় প্রচেষ্টা।

অগ্নিযুগের শেষ পর্যায়ে বোমা তৈরির ইতিহাসে হরিনারায়ণ চন্দ, যতীনদাস, গণেশ ঘোষ, ডাঃ নারায়ণ রায়, অনন্ত সিং, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, তারকেশ্বর দস্তিদার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জানা যায় যে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দণ্ডিত হরিনারায়ণ চন্দ উন্নত মানের বোমা ও নানাবিধ বিস্ফোরক পদার্থ নির্মাণে সুদক্ষ ছিলেন। আরও জানা যায় যে দক্ষিণেশ্বরে প্রাপ্ত বোমাটি তিনিই তৈরি করেন। তাঁরই-তত্ত্বাবধানে দক্ষিণেশ্বরে রাজেন লাহিড়ী প্রভৃতি বোমা তৈরি করতেন। গণেশ ঘোষও বোমা তৈরি শেখেন হরিনারায়ণ চন্দের কাছ থেকে।

বাঙ্গলাদেশের বিপ্লবীরা বোমা ছাড়াও শক্তিশালী মাইন প্রভৃতি তৈরিতেও দক্ষতা লাভ করেছিলেন। অগ্নিযুগের বোমা সম্পর্কে এই পুস্তকের জন্য শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী শ্রীগণেশ ঘোষের লিখিত বিশেষ মন্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হল :

"আমি একজন বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ নহি এবং অগ্নিযুগে ভারতের বিপ্লবী কর্মীরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভারতের মুক্তি সংগ্রামে যে বিস্ফোরক ও বোমা ব্যবহার করতেন সে সম্পর্কেও আমার বিশেষ কোন জ্ঞান নেই ; তবে আমি সে সম্পর্কে যা শুনেছি এবং দেখেছি তা থেকে বলতে পারি যে দেশপ্রেমিক বিপ্লবী কর্মীরা একেবারে প্রথম পর্যায়ে শুকনো নারকোলের খোলের ভিতর বিস্ফোরক পদার্থ এবং তার সাথে পাথরের টুকরো এবং লোহার টুকরো বোঝাই করে খোলটিকে তার দিয়ে খুব শক্ত ভাবে বেঁধে দিতেন। ওই নারকোলের খোলে একটি ছোট ছিদ্র থাকত ; যার ভিতর দিয়ে বিস্ফোরক পদার্থ

পূর্ণ একটি ছোট পলতে ভিতরে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেওয়া হোত। কিন্তু এই ব্যবস্থায় নিজেদের বিপদের সম্ভাবনাও ছিল খুব বেশী। পলতেয় আগুন লাগিয়ে ছুড়ে ফেলা হোল; বোমাটি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় হয়ত গিয়ে পড়ল; কিন্তু বিস্ফোরিত হল না। দেখা গেল পলতের আগুন তখনও ভিতরে যায় নি অথবা ছুড়ে ফেলার পর পথেই পলতের আগুন নিভে গিয়েছে; আবার এমনও নাকি হয়েছে যে পলতে তৈরিতে গুরুতর ত্রুটি থাকার ফলে হয় পলতেয় অগ্নিসংযোগের প্রায় সাথে সাথেই অথবা হাত থেকে ছুড়ে দেবার প্রায় সাথে সাথেই বোমাটি বিস্ফোরিত হয়ে ব্যবহারকারীকেই প্রচণ্ড আহত করেছে।

নারকোলের মালার পর ব্যবহৃত হয়েছে সিগারেটের টিন অর্থাৎ পঞ্চাশটি সিগারেট রাখার যে ছোট ছোট টিন বাজারে পাওয়া যায় সেই টিন। এই টিনের সুবিধা ছিল এই যে বেশ ছোট বলে এগুলিকে লুকিয়ে পকেটের ভিতর নিয়ে চলাফেরা করা যেত। এই টিনের ভিতরেও উপরিউক্ত ভাবে বিস্ফোরক পদার্থ ও লোহার এবং পাথরের টুক্‌রো পূর্ণ করে বাইরেটা তার দিয়ে খুব শক্ত করে জড়িয়ে বেঁধে দেওয়া হোত এবং উপরি উক্ত ভাবে এই টিনের হাত বোমারও বিস্ফোরণের ব্যবস্থা ছিল। ফলে এই টিনের বোমাতেও উপরিউক্ত ধরনের নানাবিধ বিপদ হয়েছে।

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সিগারেটের টিনের আয়তনে কিংবা তার চাইতে কিছু বড় আকারের ঢালাই করা লোহার খোলের (Cast iron) বোমা ব্যবহৃত হয়েছে। কোনও ঢালাই কারখানার সাথে গোপনে ব্যবস্থা করে কিছু সংখ্যক বোমার খোল ঢালাই করে নেওয়া হোত এবং আর একটি লোহার কারখানার সাথে ব্যবস্থা করে অতি গোপনে রাত্রিকালে কারখানার যন্ত্রের দ্বারা (Lathe machine) ওই লোহার খোলের চতুর্দিকে লম্বালম্বিভাবে ও গোলভাবে খাঁজ কেটে নেওয়া হোত; তার ফলে প্রত্যেকটি বোমার খোলে প্রায় ৩০।৩২টি চতুষ্কোণ টুক্‌রো তৈরি হোত। বিস্ফোরণের পর এই ছোট

ছোট লোহার টুক্‌রো গুলো ছুটে গিয়ে প্রত্যেকটি এক একটি বন্দুকের গুলি অপেক্ষাও বড় আকারে এবং আরও গুরুতর ধরনে আঘাত দিতে পারত।

সেই সময়ে বিপ্লবী কর্মীদের ব্যবহৃত বিস্ফোরক পদার্থেরও প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। ততদিনে ভারতের বিপ্লবীরা সোরা-গন্ধক-কয়লার যুগ ছাড়িয়ে বহু বহু দূর এগিয়ে এসেছে। এই যুগে "পিক্‌রিক্ এসিড"-এর বিস্ফোরক পদার্থ "অ্যামন পিক্‌রেট" বেশকিছু পরিমাণে গোপনে তৈরির ব্যবস্থা হয়েছে। তবে ঘন লোকালয় পূর্ণ অঞ্চলে এই দ্রব্য প্রস্তুত করার বেশ অসুবিধা ছিল, বিকট দুর্গন্ধে আশে-পাশের জনসাধারণ চঞ্চল হয়ে উঠত। এই সময়ে "অ্যামন্ পিক্‌রেট" ও লোহার খোলের বোমা সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতের বিপ্লবীদের অন্যতম প্রচণ্ডশক্তিশালী অস্ত্র ছিল।

এর কিছুকাল পরেই ওই তৃতীয় দশকেই প্রয়াত বিপ্লবী নেতা ডাঃ নারায়ণ রায় প্রমুখের প্রচেষ্টায় বোমার খোলেরও প্রভূত উন্নতি হয়। পূর্বের লোহার খোলের বদলে লোহার সাথে অ্যালুমিনিয়ম মিশিয়ে খোল তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল। পূর্বের বোমা অপেক্ষা এইগুলি আয়তনে হয়ত অতি সামান্য ছোট ছিল কিন্তু এই ধরনের বোমাগুলি ছিল ওজনে পূর্বের বোমাগুলির চেয়ে অনেক হালকা; ফলে এগুলি নিয়ে চলাফেরা করা অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য ছিল। এই বোমাগুলির বিস্ফোরণ ক্ষমতাও পূর্বের মতই ছিল; একটুও কম ছিল না। অবশ্য এই বোমাগুলিরও চতুর্দিকে খাঁজ-কাটা থাকত।

ডাঃ নারায়ণ রায় প্রমুখের প্রচেষ্টায় এই সময় "T. N. T." (Tri Nitro Toluene) বিস্ফোরক প্রস্তুত করা সম্ভব হয় এবং ব্যবহৃত হতে থাকে। এই বিস্ফোরক পদার্থ পূর্বে-ব্যবহৃত বিস্ফোরক অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল। চতুর্থ-দশকের প্রথমার্ধে (১৯৩০-৩৫) এই ধরনের বোমা অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।

তৃতীয় দশকের একেবারে প্রায় শেষ পর্যায়ে চট্টগ্রামে বিপ্লবী

নেতা অনন্ত সিংহ প্রমুখের প্রচেষ্টায় বোমা বিস্ফোরণ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি ঘটে। সে সময়কার লোহার খোলের বোমার খোলে একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকায় যার ভিতর দিয়ে "গান কটনে"র (Gun Cotton) একটি সরু পলতে ভিতরে চলে যেত এবং ওই ছিদ্রের মুখে একটি ছোট "ক্যাপ" (cap) আটকে রাখার ব্যবস্থা করা হত। যথাসম্ভব নিরাপদে বোমাটির বিস্ফোরণ করার জন্য নিজেরাই হাতে আর একটি অতি ছোট এবং অতি সাধারণ যন্ত্র তৈরি করে সেটি তার দিয়ে শক্ত করে বোমার খোলের গায়ে বেঁধে দেওয়া হোত। এই ছোট যন্ত্রটির উপরের দিকে থাকত বকের মাথায় ন্যায় একটি ছোট "লিভার" (lever)। এই "লিভারের" নাকটা একটি রবারের গার্টার দিয়ে বোমার একেবারে তলার সাথে বেঁধে দেওয়া হোত। ছুড়ে দেবার আগে ওই "লিভারটির" লেজের দিকটা চেপে ওদিকে আটকে রাখার জন্য খোলের নীচের দিকে একটি "হুক" থাকত। "লিভারের লেজের দিকটা চেপে আটকে দিয়ে লিভারের উঁচু নাকের ঠিক তলায় একটি ক্যাপ" (Percussion Cap) আটকে দেওয়া হোত। ফলে "লিভারের" নাকটা "ক্যাপের" ঠিক উপরটায় টানটান হয়ে উঁচু হয়ে থাকত এবং রবারের টানে নীচুতে অর্থাৎ "ক্যাপের" উপরে পড়বার জন্য উদ্যত হয়ে থাকত।

ছুড়ে দেবার পর মাটিতে পড়বার সাথে সাথেই "লিভারে"র লেজটি হুক থেকে খসে যেত এবং "লিভারে"র নাকটি "ক্যাপের" উপর পড়েই "ক্যাপটিকে" জ্বালিয়ে দিত। সঙ্গে সঙ্গেই "ক্যাপের" স্ফুলিঙ্গ ওই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে "গান কটনের" পলতে স্পর্শ করে ভিতরে চলে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিত। বিস্ফোরণের এই নূতন ব্যবস্থার ফলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বহু পরিমাণে হ্রাস পায়।

পরবর্তী কালে বিপ্লবী কর্মীদের ব্যবহৃত বিস্ফোরক পদার্থের অথবা বোমা বিস্ফোরণ ব্যবস্থার আরও কোনও উন্নতি হয়েছে কি না আমার জানা নেই।

২

আমাদের দেশের সামরিক বিভাগের সৈন্যদের যে ধরনের হাত বোমা ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয় সে গুলোর আকার এবং আয়তন একটি বেশ বড় ধরনের ডিমের মতন। এর "ক্যাপ" প্রভৃতি বিস্ফোরণের ব্যবস্থা সবই বোমার খোলের ভিতরে, শুধু ভিতরের এই সব ব্যবস্থার সাথে সংলগ্ন একটি ছোট "লিভার" বাইরে থাকে। এই "লিভারটিকে" নীচু করে চেপে বোমার খোলের গায়ের সাথে স্থায়ীভাবে আটকে রাখার জন্য একটি ছোট "হুক" আছে। ওই "লিভারটি" ভিতরে একটি স্প্রিং (Spring)-এর সাথে যুক্ত থাকে এবং বাইরের হুকটি খুলে ছেড়ে দিলেই "লিভারটি" সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং ভিতরে "ক্যাপে" আঘাত করে বিস্ফোরণ ঘটায়। ব্যবহারের সময় ডান হাতে ওই "লিভার" সহ বোমাটিকে চেপে ধরে দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে হুকটি খুলে ফেলতে হয়। তারপর বোমাটি ছুড়ে দিলেই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বিস্ফোরণ ঘটে যায়।

শ্রীগণেশ ঘোষের এই বিবরণ যে অগ্নিযুগের উন্মেষ কালের নারকোল খোলের ও টিনের খোলের বোমা থেকে সুরু করে খাঁজকাটা লোহার খোলের ও অ্যালুমিনিয়ম খোলের বোমার এবং সোরা গন্ধক কাঠ কয়লার পরিবর্তে টি. এন. টি. অ্যামনপিক্রেট প্রভৃতি বিস্ফোরক পদার্থের ক্রমোন্নয়নের উপর যথেষ্ট আলোক সম্পাত করেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; তবে "ট্রিগার টাইপ" (Trigger type) ধরনের বোমা তৈরির ক্ষেত্রে যে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। এই বিবরণীতে "ট্রিগার টাইপ" ধরনের এবং আধুনিক যুগের সামরিক বোমার যন্ত্ররহস্য (Mechanism) এবং প্রয়োগবিধি যথেষ্ট পরিমাণে পরিস্ফুট হয়েছে।

পরবর্তী কালের শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের ফলে বহু খণ্ডাংশ (Splinters) বুলেটের মত তীব্র বেগে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ত; ফলে বোমা নিক্ষেপকারী একাকী একটা বোমার সাহায্যে বহু

লোকের মহড়া নিতে পারত এবং শুধুমাত্র একটি বোমা নিক্ষেপ দ্বারা বহু লোককে ছত্রভঙ্গ করা সহজসাধ্য হোত। এই কারণেই ব্যক্তি হত্যার ক্ষেত্রে পিস্তলের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হলেও খণ্ডযুদ্ধে বোমার প্রয়োজনীয়তা যে সমধিক তা স্বীকার করতেই হয়।

অগ্নিযুগের সমগ্র বিপ্লব আন্দোলনে ইংরেজ শাসকের অন্তরে সন্ত্রাস ও ভীতি সৃষ্টির জন্য বোমার এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এর প্রমাণ হল বোমাকে কেন্দ্র করে নিম্নলিখিত ষড়যন্ত্র মামলা সমূহের সৃষ্টি ঃ

(১) আলিপুর বোমার মামলা বা মুরারিপুকুর বোমার মামলা।

(২) মুন্সীগঞ্জ বোমার মামলা।

(৩) রাজাবাজার বোমার মামলা।

(৪) মানিকতলা বোমার মামলা বা দ্বিতীয় আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা।

(৫) দক্ষিণেশ্বর এবং শোভাবাজার বোমার মামলা।

(৬) মানমদ বোমার মামলা।

(৭) দিল্লী পরিষদ ভবনে বোমা নিক্ষেপ সংক্রান্ত মামলা।

(৮) ভুসোয়াল বোমার মামলা।

(৯) মেছুয়াবাজার বোমার মামলা।

(১০) ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলা।

এ ছাড়া দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় এবং লাহোর ষড়মন্ত্র মামলা সমূহেও বোমার এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

বোমা সংক্রান্ত বিবিধ ঘটনা

এই পুস্তকের সীমিত ক্ষেত্রে ভারতের নানা স্থানের অসংখ্য বোমা সংক্রান্ত ঘটনার উল্লেখ সম্ভব নয় বলে কালানুক্রমিক ভাবে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা হল ঃ

১৯০৭

চন্দননগরে ছোটলাট স্যার অ্যাণ্ড ফ্রেজারের ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টা

১৯০৭ সালেব নভেম্বর মাসে প্রথমে চন্দননগরে ও তার কয়েকদিন পর মানকুণ্ডু স্টেশনে রেল লাইনের উপর বোমা রেখে ছোটলাট স্যার অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারের ট্রেন ধ্বংসের এক চেষ্টা হয়। চেষ্টাটি সফল হয়নি। মুরারিপুকুর বোমার মামলার রাজ সাক্ষী নরেন গোঁসাইর স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় যে চন্দননগরে এবং মানকুণ্ডু স্টেশনে ছোটলাটের ট্রেন ধ্বংসের জন্য যে দু-টি বোমা ব্যবহার করা হয়েছিল তন্মধ্যে প্রথম বোমাটি ছিল একটা লোহার গ্লাসের মত আর তার উপর চাকতি ছিল; দ্বিতীয় বোমাটাও ছিল গ্লাসের মত। (১৪)

নৈহাটি স্টেশনে ফুলারের ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টা

১৯০৭ সালে নৈহাটি স্টেশনে বোমার সাহায্যে পূর্ববঙ্গের লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর স্যার ব্যোমফিল্ড ফুলারের ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টা হয়; কিন্তু লাট সাহেবের ট্রেনটিকে নৈহাটি স্টেশন অতিক্রম করার পূর্বেই অন্য পথ দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়ায় ট্রেন ধ্বংসের প্রচেষ্টা কার্যকরী রূপ নিতে পারে নি।

নারায়ণগড়ে মাইন স্থাপন দ্বারা ছোটলাটের ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টা

১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর খড়্গপুরের নিকট বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের নারায়ণ গড় নামক মেদিনীপুর জেলার ছোট্ট এক স্টেশনে ছোটলাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারের (Sir Andrew Fraser) ট্রেন ধ্বংসের জন্য রেল লাইনে একটি মাইন পাতা হয়। এই মাইনটি উল্লাসকর দত্ত গোয়াবাগানের বাড়িতে তৈরি করেন। এই মাইনের

ফিউজ (Fuse) বা সংযোজক নল পিক্রিক এসিড (Picric Acid) এবং ক্লোরেট অব পটাশ (Chlorate of Patash) প্রভৃতি বিস্ফোরক পদার্থে পূর্ণ ছিল। উল্লাসকর দত্তের তৈরি এই মাইন সম্পর্কে আলিপুর বোমার মামলার রায়ের অংশ বিশেষের মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হল :

'He (Ullaskar) states that he used to prepare explosives, which he had learned to do before joining the society in a private laboratory of his. He stated that he made a futile attempt to wreck the Lieutenant Governor's train but could not set the mine properly, as the train arrived too soon. He made the mine himself and also the one intended for the attempt at Kharagpur, though he did not go actually on the latter expedition. This mine he says he made in a house at Goabagan." (15)

নারায়ণগড়ে ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টাও সফল হয় নি। আলিপুর বোমার মামলার রায়ের এই অংশ থেকে জানা যায় যে উল্লাসকর গুপ্ত সমিতিতে যোগদানের পূর্বে নিজস্ব ল্যাবোরেটারীতে বিস্ফোরক পদার্থ তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই রায়ের অন্য অংশে বলা হয়েছে :

"He (Ullaskar) thus admits making mines for two attempts and also that he made explosives in the garden." (16)

এ থেকে মনে করা যায় যে মানকুণ্ডুতে ট্রেন ধ্বংসের জন্য যে বিস্ফোরক পদার্থ ব্যবহৃত হয়েছিল নরেন গোঁসাইর স্বীকারোক্তিতে তা বোমা বলে উল্লেখ করা হলেও প্রকৃত পক্ষে তা ছিল উল্লাসকর দত্তের তৈরি মাইন এবং যথাযথ ভাবে মাইন সংস্থাপনের পূর্বেই ট্রেন এসে পড়ায় ট্রেন ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। এখানে বেশ সুস্পষ্টরূপে

উল্লেখ আছে যে দু-টি প্রচেষ্টার জন্য উল্লাসকর মাইন তৈরি করেন ; তন্মধ্যে প্রথমটি হোল চন্দননগরের নিকট মানকুণ্ডু স্টেশনে আর দ্বিতীয়টি হোল নারায়ণ গড়ে।

সংগৃহীত সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে মনে হয় চন্দননগরে রেলপথ ধ্বংসের জন্য বোমা এবং মানকুণ্ডু স্টেশনে ও নারায়ণগড়ে ট্রেন ধ্বংসের জন্য মাইন ব্যবহৃত হয়।

নারায়ণগড় স্টেশনে ছোটলাটের ট্রেন ধ্বংস প্রচেষ্টার কিছু নিদর্শন এখনও খড়্গপুর রেলওয়ে ওয়ার্কসপের টেষ্ট-হাউসে রয়েছে।

"খড়্গপুর রেলওয়ে ওয়ার্কসপের টেষ্ট-হাউসে সেই ধ্বংস প্রাপ্ত রেল লাইন রেখে দেওয়া হয়েছে। সেখানে লেখা আছে।

"Rail Damaged In Explosion Near Narayangarh under the Special Train of H.E. Sir Andrew Fraser K. C. I. E. Lieut. Governor of Bengal on 6. 12. 07." (17)

সিডিসন কমিটির রিপোর্টে নারায়ণগড়ে ছোটলাটের ট্রেন ধ্বংসের এই ঘটনাটির উল্লেখ আছে। নিক্সন রিপোর্টে চন্দননগরের ও নারায়ণগড়ের ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"In November, 1907 two unsuccessful attempts were made to wreck by bombs the Lieutenant Governor's train near Chandannagore, while on 6th December, 1907, a further attempt was made near Narayangarh, Midnapore." (18)

নিক্সন রিপোর্টের এই বিবরণ থেকে জানা যায় চন্দননগরের নিকট বোমার সাহায্যে দু বার ছোটলাটের ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টা হয়, কিন্তু চেষ্টা সফল হয় নি। বোমাই হোক আর মাইনই হোক অগ্নিযুগের উন্মেষ কালেই বিপ্লবীরা ট্রেন ও রেলপথ ধ্বংসের উপযোগী অতি বিস্ফোরক পদার্থ তৈরি করতে সমর্থ হন। এসব তথ্য থেকে তা বেশ পরিস্ফুট হয়।

১৯০৮

দেওঘরের নিকট বোমার কার্যকারিতা পরীক্ষার মর্মন্তুদ পরিণতি

১৯০৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী দেওঘরের নিকটবর্তী দিঘিরিয়া নামক এক নির্জন পাহাড়ের মাথায় উল্লাসকর দত্তের তৈরি বোমার কার্যকারিতা পরীক্ষাকালে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে অন্যতম বিপ্লবকর্মী প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন, উল্লাসকর দত্তও আহত হন; তবে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। প্রথম পরীক্ষার বোমার কার্যকারিতা ও শক্তি প্রমাণিত হোল বটে কিন্তু পরীক্ষার সমাপ্তি ঘটল এক একনিষ্ঠ বিপ্লব কর্মীর শোচনীয় মৃত্যুর বিষাদান্তক পরিণতিতে। বোমা বিস্ফোরণের ফলে এরূপ দুর্ঘটনায় বিপ্লব-কর্মীর হতাহতের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়।

চন্দননগরের মেয়র হত্যা প্রচেষ্টা

ফরাসী চন্দননগরের মেয়র মঁসিয়ে তার্দিভ্যাল নিষেধাজ্ঞা জারী করে পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে আয়োজিত এক রাজনৈতিক সভার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেন এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ফরাসী চন্দননগরের অস্ত্র আইন সম্পর্কে কড়াকড়ি করায় বিপ্লবীদের পক্ষে ফরাসী চন্দননগর থেকে অস্ত্র সংগ্রহের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়। এর ফলে তিনি বিপ্লবীদের বিরাগভাজন হন। মঁসিয়ে তার্দিভ্যালকে হত্যার সংকল্প নিয়ে বিপ্লবীরা ১৯০৮ সালের ১১ই এপ্রিল রাত্রে চন্দননগরে তাঁর গৃহে নৈশ-ভোজের সময় এক বোমা নিক্ষেপ করেন। বোমাটি বেশ মারাত্মক ধরনের ছিল এবং জানা যায় চন্দননগরে মেয়রের গৃহে নিক্ষিপ্ত বোমাটি হেমচন্দ্র দাস কানুনগোর তৈরী। যাক্, দৈবক্রমে তার্দিভ্যাল সাহেব বেঁচে যান। আলিপুর বোমার মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইর স্বীকৃতিতেও চন্দননগরের মেয়রের গৃহে বোমা নিক্ষেপের উল্লেখ আছে।

মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণ

ইংরেজী ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার। সেদিন ছিল অমাবস্যা, বাংলা ১৩১৫ সালের ১৭ই বৈশাখ। রাত্রি আনুমানিক সাড়ে আটটার সময় মজঃফরপুরে মিঃ কিংসফোর্ড ভ্রমে মিসেস ও মিস্ কেনেডি নাম্নী দু-জন ইংরেজ মহিলার গাড়ির উপর ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী যে বোমা নিক্ষেপ করেন, তা টিনের খোলের Round type ধরনের হলেও মারাত্মক বিস্ফোরণ ক্ষমতা-সম্পন্ন ছিল। ঐ বোমাটিও হেমচন্দ্র দাস কানুনগোর তৈরী। তবে আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্লি সাহেবের নিকট প্রদত্ত বারীণ ঘোষের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে হেমচন্দ্র দাস কানুনগো ও উল্লাসকর দত্তের মিলিত প্রচেষ্টায় এই বোমাটি তৈরি হয়। মজঃফরপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উড্ম্যানের নিকট প্রদত্ত ক্ষুদিরামের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, তাঁর নিক্ষিপ্ত টিনের খোলের বোমাটি ৩।৪ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট Round type ধরনের। ক্ষুদিরাম মজঃফরপুরের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পরদিন অর্থাৎ ১লা মে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত তাঁর জবানবন্দিতে বলেন :

"The bomb was of tin. It was round and about so big." (Shows with his hands a size about 3 or 4 inches in diameter). (19)

এই বোমা বিস্ফোরণের ফলে কিংসফোর্ডের পরিবর্তে মারাত্মকরূপে আহত মিস্ কেনেডির এক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু ঘটে; আর মিসেস কেনেডির মৃত্যু ঘটে ২রা মে ভোরে। যে ঘোড়ার গাড়ির উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, তা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কোচম্যান্ কালীরাম আহত হয়। সহিস সঙ্গতরাম দুসাদ গুরুতর আহত হওয়ার ফলে অজ্ঞান হয়ে ছিটকে পড়ে। মজঃফরপুরের বোমা বিস্ফোরণের এই ঘটনা সম্পর্কে ক্ষুদিরামের সেসন আদালতের বিচারের রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশ নিয়ে উদ্ধৃত হল :

'On the night of the 30th April last at about half-past eight o' clock, as Mrs and Miss Kenedy were driving home in the dark from the Muzzafferpore station club past the judge's house a bomb was thrown into their carriage and exploded, shattering the vehicle, maiming the Syce on the foot board and causing such frightful injuries to the unfortunate ladies that the younger of them died with in an hour and the other survived only until the morning of the 2nd May. The theory of the prosecution is that the bomb was intended for Mr Kingsford, the District and Sessions judge of Muzzafferpore, who had shortly before been transferred from his appointment of Chief Presidency Magistrate and bears in that capacity the displeasure of a section of the Vernacular Press." (20)

মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণের পর কেশরী পত্রিকায় ১২ই মে ও ৯ই জুন তারিখে যথাক্রমে "The Country's Misfortune" এবং "These remedies are not lasting" নামক লোকমান্য তিলক রচিত দু-টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই দু-টি প্রবন্ধের জন্য তিলক রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং ছ-বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে মান্দালয়ে নির্বাসিত হন।

পাঠকদের অবগতির জন্য তিলক রচিত প্রবন্ধ দু-টির প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল :

The Country's Misfortune

"All thoughtful people seem to have formed one opinion as to the cause that gave rise to the bomb party. The bomb party has come into existence in consequence of the oppression practised by the official class. The

harrassment inflicted by them and their obstinacy in treating public opinion with recklessness. The bombs exploded owing to the official class having tried the patience of the Bengalees to such a degree that the heads of the Bengalee youths became turned. The responsibility of this calamity must, therefore, be thrown not on the political agitation, writings or speeches, but on the thoughtlessness and the obstinacy of the official class." (21)

These remedies are not lasting

"The real and lasting means of stopping the bomb-ontrage consists in making a beginning to grant the important rights of Swarajya to the people. It is not possible for measures of repression to have a lasting effect in the present condition of Western sciences and that of the people of India." (22)

২২শে জুন কেশরী পত্রিকায় তিলকের আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল :

"Neither the Chapekars nor the Bengali bomb-throwers committed murders for retaliating the oppression practised upon themselves ; hatred between individuals or private quarrels or disputes were not the cause of the murders. These murders have assumed a different aspect from ordinary murders owing to the supposition on the part of the perpetrators that they were doing a sort of beneficient act. ......Moreover, a pistol or a musket is an old weapon while the bomb is the latest discovery of the Western scientist... It was the Western science itself that created new guns, new muskets, and new ammunition ; and it was the Westerner's

science itself that created the bomb...The militany strength of no Government is destroyed by bomb ; the bomb has not this power of crippling the power of an army, nor does the bomb possess the strength to change the current of military strength, but owing to the bomb the attention of Government is attracted towards the disorder which prevails owing to the pride of military strength." (23)

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যায় যে এর আগে কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে বইয়ের মধ্যে একটা বোমা পুরে তাঁর নামে পাঠানো হয় কিন্তু ভাগ্যক্রমে তা কিংসফোর্ড সাহেবের হস্তগত হয় নি, ফলে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। বোমাটি যে খুব মারাত্মক ছিল, তা সরকারী রিপোর্ট থেকে জানা যায়।

"It was discoverd exactly in the book lying unopened in the house of Mr Kinsford and has been described by Muspratt Williams, chief Inspector of explosives of the India Govt. as "a most distructive bomb had it exploded." (I. B. Records of the Govt. of West Bengal. File No-Vi/1085 /1909. (24)

মুরারিপুকুর বাগান বাড়ি ও অন্যান্য স্থানে পুলিসী খানাতল্লাসী

মজঃফরপুরের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পর কলকাতায় বিপ্লবীদের মুরারিপুকুরের আস্তানা ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে খানা-তল্লাসী কালে বোমা, বোমা তৈরির সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও মালমসলা, বিভিন্ন ধাতুর তৈরি নানা ধরনের বোমার খোল এবং বোমা নির্মাণ প্রণালী ও নানারকম বিস্ফোরক তৈরির সংকেত সূত্র বা ফর্মূলা আবিষ্কৃত হয়।

৩২ নং মুরারিপুকুর রোডের বাগান বাড়িতে একদিকে যেমন

পিক্রিক এ্যসিড্ (Picric Acid), ক্লোরেট্ অব্ পাটাশ (Chlorate of potash) প্রভৃতি বোমা তৈরির মালমসলা আবিষ্কৃত হয়, অন্যদিকে তেমনি পাওয়া যায় টিন, তামা, পিতল এবং অন্যান্য ধাতু নির্মিত নানা ধরনের বোমার খোল। এ সকল জিনিস ছাড়াও এ স্থানে পাওয়া যায় বোমা তৈরির নানা ধরনের যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন ধরনের বোমার ধাতু নির্মিত খোল তৈরির উপযোগী নানা আকারের ছাঁচ ও সাজ সরঞ্জাম, রাইফেল বন্দুক ও কিছু কিছু গুলিবারুদ, বোমা তৈরির একখানি প্রামাণ্য পুস্তিকাও পাওয়া যায়। সাইক্লোষ্টাইল করা ৬০ পৃষ্ঠায় এই পুস্তিকা খানির ভূমিকায় এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

'The aim of the present work is to place in the hands of a revolutionany people such a powerful as explosive matter is."

এ থেকে জানা যায় যে এই পুস্তিকা খানির উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবীদের হাতে বিস্ফোরক পদার্থের ন্যায় শক্তিশালী অস্ত্র তুলে দেওয়া। এই পুস্তিকার ভূমিকায় আরও বলা হয়েছে ;—

"The simplest and quickest methods (i.e. of preparation) have been selected and the most powerful and the most shattering substances have been chosen."

সরকারী নথিপত্রে এই পুস্তিকা খানি "Bomb Manual" বা "Manual of Explosives" নামে উল্লিখিত হয়েছে। বিষয় অনুসারে এই ম্যানুয়েল নিম্নলিখিত তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অধ্যায়ে—বিস্ফোরক পদার্থ তৈরির বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে—বোমার খোল তৈরির কলা কৌশল বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে—বিস্ফোরক পদার্থ সমূহের ব্যবহার বর্ণিত হয়েছে। (২৫)

ভারত সরকারের বিশেষজ্ঞ (Officiating Inspector of explosives to the Government of India) মেজর স্মলউডের (Major Smallwood) মতে এই পুস্তকে বিস্ফোরক পদার্থ নির্মাণের সহজ প্রণালী এত সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কারিগরি বিদ্যাশিক্ষা (Technical Education) ব্যতীত যে কোনও ব্যক্তির পক্ষে এই পুস্তিকার বর্ণিত বিস্ফোরক পদার্থ তৈরি প্রণালীর সহায়তায় অতি মারাত্মক বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত করা সম্ভব। এ ছাড়া দালান ও সেতু ধ্বংস করতে হলে কি ধরনের ও কি পরিমাণ বিস্ফোরক পদার্থের প্রয়োজন এতে তার উল্লেখ আছে বলে মেজর স্মলউড্ তাঁর প্রতিবেদনে মন্তব্য করেছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে ৩২নং মুরারিপুকুর রোডের বাগান-বাড়িতে ১৯০৮ সালের ২রা মে খানা তল্লাসী কালে সাইক্লোষ্টাইল করা যে Bomb Manual পাওয়া যায় ঠিক তারই অবিকল আর একটি সাইক্লোষ্টাইল কপি ১৯০৯ সালের ২রা মার্চ নাসিকে গণেশ দামোদর সাভারকরের গৃহ খানাতল্লাসীকালে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে সিডিসন কমিটির মত :—

"60 pages of closely matter in English which proved to be a copy of the same bomb manual of which cyclostyled copy was found in the Manicktala Garden. Savarkar's copy was more complete, as it contained 45 sketches of bombs, mines and buildings to illustrate the text."

এ সম্পর্কে ক্যাম্পবেল কের সাহেবের মত :

"A second copy was found in the house of Ganesh Damodar Savarkar when it was searched at Nasik and a third in a box belonging to Bhai Pramananda of Lahore. In the course of enquiry in to the bomb conspiracy a victoria British Columbia, it was found that a copy of

this book had been sent from Paris in January, 1914, to Harnam Singh of Sahri." (26)

এই বিবরণ থেকে জানা যায় যে মুরারিপুকুরে প্রাপ্ত "Bomb Manual"-এর দ্বিতীয় কপি পাওয়া যায় নাসিকে গনেশ দামোদর সাভারকরের গৃহে, তৃতীয় কপি পাওয়া যায় লাহোরে ভাই পরমানন্দের কাছে। এ ছাড়া ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ভিক্টোরিয়া বোমা ষড়যন্ত্র মামলার তদন্তকালেও এর একটি কপির সন্ধান পাওয়া যায় এবং জানা যায় যে ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে প্যারিস থেকে এর এক কপি হরনাম সিং-এর নিকট পাঠানো হয়।

এ সম্পর্কে সরকারী প্রতিবেদন ছাড়াও দু-টি বেসরকারী মত বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

বন্ধুবর ক্ষীরোদকুমার দত্তের মতে "অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং বোমার প্রস্তুত চেষ্টা এর আগেই আরম্ভ হয়েছিল। ১৯০৭ সালের শেষদিকে হেমচন্দ্র কানুনগো লণ্ডনে পৌছেন। তাঁর সঙ্গে সেনাপতি বাপাতেরও বোমা প্রস্তুত শেখার ব্যবস্থা হয়। বাপাত জনৈক রুশ রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে একখানি বোমা প্রস্তুত প্রণালী শেখার পুস্তক সংগ্রহ করেন। হেমচন্দ্র ঐ পুস্তিকার ফটোচিত্র গ্রহণ করে রাখেন। বাপাত-এর পরে মিস্ আনিয়া নামে জনৈক রুশ কিশোরীর সাহায্যে পুস্তিকার ইংরেজী অনুবাদ করে নেন। এই পুস্তিকার সাইক্লোষ্টাইল কপি নিয়েই সেনাপতি বাপাত, হোতিলাল বর্মা এবং হেমচন্দ্র দাস ভারতে আসেন একই সময়ে। ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।" (২৭)

ক্ষীরোদবাবুর এই বিবরণ থেকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই ধারণা করা যায় যে মারাঠী বিপ্লবী সেনাপতি বাপাতের সাইক্লোষ্টাইল কপি নাসিকে গনেশ দামোদর সাভারকরের গৃহে এবং হেমচন্দ্র দাস কানুনগোর আনীত সাইক্লোষ্টাইল কপি ৩২নং মুরারিপুকুর রোডের বাগান বাড়িতে পাওয়া যায়।

নাসিকে ও মুরারিপুকুরের বাগান বাড়িতে একই ধরনের বোমা তৈরির পুস্তিকার সাইক্লোষ্টাইল কপি ও একই সংকেত সূত্র বা ফর্মুলা (Formula) পাওয়া বিচিত্র নয়। বাঙ্গালার বিপ্লবীদের সাথে মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। অগ্নিযুগের সূচনা থেকেই উভয় স্থানের বিপ্লবীরা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে বোমার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন।

শ্রদ্ধেয় শ্রীতারাপদ লাহিড়ীর মতে :

"Hem Chandra Kanungo (Das) of Alipur conspiracy case had been sent to France by his friends Barin and others of Calcutta Anushilan Samiti for equipping himself with the art and technique of bomb manufacture. Kanungo got substantial help from Madam Cama, S.R. Ranaji for the success of his mission. The latter provided him with a laboratory at his own cost where Kanungo could carry on his experiments. It was Ranaji who managed to get an English translation of a book about bomb-making from French Revolutionaries." (28)

এ ছাড়া ৩২নং মুরারিপুকুর রোডের বাগান বাড়ি খানাতল্লাসী-কালে একটি সাইক্লোষ্টাইল কাগজে বত্রিশটি বিস্ফোরক পদার্থের নাম পাওয়া যায়।

১৫নং গোপীমোহন দত্ত লেনে খানাতল্লাসী-কালে বিস্ফোরক পদার্থের সংকেত সূত্র (Formula) ও বোমা তৈরির নির্দেশ লেখা একখানা কাগজ পাওয়া যায়।

১৩৪ নং হ্যারিসন রোড্ খানাতল্লাসী-কালে কমপক্ষে সাতটি বোমা পাওয়া যায়। এই বোমাগুলোর অন্যতম একটির খোলের ভিতর প্রায় এক পাউণ্ড পিকরিক্ এসিড্ (Picric Acid) ছিল,

আর ছিল দু-দিকে ছুচোলো দু-ইঞ্চি বা তার চেয়ে বেশী লম্বা ধরনের ২৪টি পেরেক। মেজর স্মলউড্ এই বোমাটি পরীক্ষা করে বলেছেন যে, এই বোমার মারণ ক্ষমতা ও ধ্বংসাত্মিকা শক্তি সুনিশ্চিত রূপে ৭০ গজ পর্যন্ত এবং এ ধরনের বোমা সাধারণতঃ সামরিক প্রয়োজনে হাতাহাতি যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। বোমাটি গ্রেনেড্ ধরনের বলা যেতে পারে। বোমাটি আলিপুর বোমার মামলায়—৬১০নং একজিবিট্ (Exhibit) রূপে প্রদর্শিত হয়। তা ছাড়া এখানে পিতলের এবং টিনের খোলের দু-টি বোমা পাওয়া যায়।

উভয় বোমার খোলের মধ্যেই পিক্‌রিক্ এসিড্ নামক মারাত্মক বিস্ফোরক পদার্থ ছিল। বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থাকায় খোলগুলো থেকে সতর্কতার সাথে বিস্ফোরক পদার্থ বের করে নেওয়া হয়। এখানে খানাতল্লাসী-কালে তামার খোলের একটি মারাত্মক বোমা পাওয়া যায়। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আশঙ্কায় ভারত সরকারের বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ মেজর স্মলউড্ (Major Smallwood) এবং বাংলা সরকারের রসায়নবিদ্ মেজর ব্লক (Major Block) বোমাটির কার্যকারিতা নষ্ট করে বোমাটিকে নিষ্ক্রিয় করে দেন। তাঁদের আশঙ্কা ছিল যে তামার সাথে পিক্‌রিক্ এসিডের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে কপার পিক্রেট (Copper picrate) নামক অতি-মারাত্মক বিস্ফোরক পদার্থ সৃষ্টি হতে পারে। আলিপুর বোমার মামলার ৩৬ নং একজিবিটে এই বোমার ফটোচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এই সাতটি বোমা ছাড়াও এখানে চারটি বোমার ধাতু নির্মিত খোল পাওয়া যায়। এখানে ডিনামাইট, কার্তুজ, ফিউজ, ডিটোনেটর, পিক্‌রিক্ এসিড্, পারদ, বোমা তৈরির উপযোগী নানারকম রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, কার্তুজ ও বারুদ পাওয়া যায়। এখানে Illustrated London News-এর ৯ই জুনের একটি সংখ্যা পাওয়া যায়। তাতে স্পেনের রাজা ও রাণীর হত্যা প্রচেষ্টায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বোমার ছবি ও বিবরণ ছিল।

আলিপুর বোমার মামলায় প্রদর্শিত ৩৮২ নং একজিবিটে দু-টি সাঙ্কেতিক সূত্রের (Formula) সন্ধান পাওয়া যায়।

১। Ch P+Sa+A. P
12 6 1

২। P+Ch. P
1 1
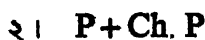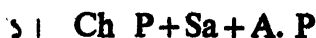
তৎকালীন বাঙ্গালা সরকারের রসায়নবিদ্ মেজর ব্লকের মতে উভয় সাঙ্কেতিক চিহ্ন বিস্ফোরক পদার্থ নির্মাণের উপকরণ-সমূহের অনুপাত নির্দেশক সংকেত সূত্র। তিনি এই সাঙ্কেতিক চিহ্নের মর্মোদ্ধার করে বলেন যে, Ch. P হচ্ছে Chlorate of Potash, Sa হচ্ছে Sulphide of Antimony, A. P হচ্ছে Amorphous Phosphorus, P হচ্ছে Phosphorus. (২৯)

প্রথম দিকে মুরারিপুকুরের গুপ্ত সমিতিতে বোমা তৈরির ভার ছিল উল্লাসকর দত্তের উপর ; পরে হেমচন্দ্র দাস কানুনগো ইউরোপ থেকে বোমা তৈরি শিখে ফিরে এলে তাঁর উপরেও বোমা তৈরির ভার পড়ে। তখন থেকে বোমা তৈরি করতেন উল্লাসকর দত্ত ও হেমচন্দ্র দাস কানুনগো। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে হেমচন্দ্র থাকতেন ১৫নং গোপীমোহন দত্ত লেনে। তাঁর বোমা তৈরির স্থান ছিল : ১৫নং গোপীমোহন দত্ত লেন ও ৩৮।৪নং রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট্। তিনি ৩২নং মুরারিপুকুরের বাগান বাড়িতে বোমা তৈরি করতেন না ; ওখানে বোমা তৈরি করতেন উল্লাসকর দত্ত। তাঁর সম্পর্কে জানা যায় যে মুরারিপুকুরের গুপ্ত সমিতিতে যোগদানের পূর্বে তিনি গোয়াবাগানে নিজস্ব ছোট্ট এক ল্যাবোরেটরীতে বিস্ফোরক পদার্থ তৈরি বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা সুরু করেন। আরও জানা যায় যে বরানগরের আত্মোন্নতি সমিতির সদস্যগণকেও নাকি তিনি বোমা তৈরি করা শেখাতেন। তাঁর সম্পর্কে আলিপুর বোমার মামলায়

রায়ের অংশ বিশেষ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে; এখানেও তাঁর সম্পর্কে ঐ রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশ উল্লেখ করা হল :

"He (Ullaskar) also used to prepare and experiment with explosives. He also states that Hemchandra Dass used to make explosives, but not in the Garden. He says he knew that Prafulla and Khudiram went to Muzzafferpur because he was at Gopi Nath Dutt's (Gopi Mohan Dutt's) Lane when they started. He states he heard that Hem made the bomb, but he was not present". (৩০)

হেমচন্দ্র দাস কানুনগো সম্পর্কে আলিপুর বোমার মামলার রায়ে বিচারপতি বীচক্রফ্‌ট্ (C. P. BeachCroft) সাহেবের মন্তব্য :—

"I next take the case of Hem Chandra Dass. He is mentioned by Baren (Barin Ghosh) in his confession as having sold part of his property and gone to Paris 'to learn mechanics and if possible explosives'. The date of his leaving appears to have been September, 1906. Then Baren (Barin) mentions him as joining Ullaskar in prepaing explosives at no 38/4, when he was living at No 15 Baren (Barin) mentions him as having made the Chandannagore bomb and in conjunction with Ullaskar made the bomb, which was used at Muzzafferpur. Ullaskar in his confession mentions Hem as making bombs at No 38/4 and No 15. He gives Hem the sole credit for making the Muzzafferpur bomb, but he says he was not present when it was made. He also mentions Hem as one of the regular workers. Upen in his confession, says that he knew that Baren (Barin), Ullaskar, and Hem were engaged in making bombs :

From the confession of Baren (Barin) and the evidence

of witness No 104 it would appear that he returned to India about December 1907, or January 1908. The witness Suresh heard of him in January or February and on the 20th March Biswas got orders to follow him." (৩১)

হেমচন্দ্র দাস কানুনগো সম্পর্কে এই রায়ের অন্যত্র বলা হয়েছে :

"All the facts show his complicity in conspiracy and he seems to have shared with Ullaskar Dutta the position of chief manufacturer of explosives". (৩২)

১৯০৮ সালে নানাস্থানে নারকোল খোলের বোমা বিস্ফোরণ

২১শে জুন—নৈহাটির নিকটবর্তী কাঁকিনাড়াতে নারকোল খোলের বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণের ফলে কেউ হতাহত হয় নি।

২২শে আগষ্ট—শ্যামনগরে, ২৪শে নভেম্বর বেলঘরিয়ায় ও আগরপাড়ায় এবং ২১শে ডিসেম্বর সোদপুরে ও খড়দহে নারকোল খোলের বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। (৩৩)

১৯০৯

১০ই ফেব্রুয়ারী বেলঘরিয়ায় ও ৫ই এপ্রিল আগরপাড়ায় নারকোল খোলের বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। শেষোক্ত ঘটনায় বিস্ফোরণের ফলে দু-জন আহত হয়।

এ ধরনের বোমা নিক্ষেপের ঘটনা সম্পর্কে নিক্সন রিপোর্টের বিবরণ :—

"From May, 1908 onwards this gang (Bhatpara Gang, a branch of the Atmonnati Samiti) commenced a series of bomb outrages with a species of bomb of which the casing

was composed of cocoanut shell. The following outrages were probably the work of this gang.

Kakinara Bomb—22nd June, 1908.

Shamnagar Bomb—12th August, 1908.

Chandan Nagore Bomb—12th August, 1908.

Belgharia-Agarpara Bomb—24th November, 1908.

Sodepur Kharda—21th December, 1908.

Belgharia-Agarpara—10th February, 1909.

Agarpara—15th April, 1909.

Punitive police had been placed along the Eastern Bengal Railway, but without any apparent effect. The actual perpetrators were eventually found to be a party of nine Brahmins of Bhatpara near Naihati, led by one Narendra Nath Bhattacharji, who was bound down u/s 110 (e), (f) and (g) of C. P. C. on 15th July, 1910." (৩৪)

১৯০৯

বড়লাটের আমেদাবাদ পরিদর্শনকালে নারকোল খোলের বোমা বিস্ফোরণ

বাঙ্গালার বাইরেও এ ধরনের নারকোল খোলের বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এর একটি প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯০৯ সালের ১৩ই নভেম্বর সস্ত্রীক বড়লাট দ্বিতীয় মিণ্টোর আমেদাবাদ পরিদর্শন কালে। ঐ দিন বড়লাটের গাড়ি যখন রানী শিপ্রি মসজিদের দিকে যাচ্ছিল তখন শহরের বাইরে সারংপুর এবং রায়পুর গেটের মধ্যবর্তী স্থানে গাড়ি লক্ষ্য করে দু-টি নারকোল খোলের বোমা নিক্ষেপ করা হয়। প্রথম বোমা বিস্ফোরণের ফলে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যায় গাড়ির বাঁ দিকের অশ্বারোহী জনৈক সার্জেণ্ট; দ্বিতীয় বোমা বিস্ফোরণের ফলে আহত হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে

বড়লাটের রাজকীয় ছত্রধারী চোপদার ; কিছু পরে বোমা বিস্ফোরণের ফলে ক্ষতবিক্ষত জনৈক ঝাড়ুদারকে ঘটনা স্থলের নিকটে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় ; আশেপাশে বোমার টুকরো পাওয়া যায় ; আর একটি বোমাও পাওয়া যায় ; কিন্তু সেটির বিস্ফোরণ হয় নি। (৩৫)

লর্ড মিণ্টোর উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত নারকোল খোলের বোমাগুলো একেবারে মারাত্মক ছিলনা, তা বলা চলে না। জানা যায় মোহন প্রসাদ পাণ্ড্যে নামক জনৈক গুজরাটী বিপ্লবী কর্তৃক এই বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। (৩৬)

বিনায়ক দামোদর সাভারকরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ দামোদর সাভারকর এই ব্যাপারে গ্রেপ্তার হন ; কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে বোমা নিক্ষেপের অভিযোগ প্রমাণিত না হলেও তিনি ছ-মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

অগ্নিযুগের সূচনাতেই বিভিন্ন স্থানে বোমা নিক্ষেপের ঘটনা সরকারকে এত শঙ্কিত ও বিচলিত করে যে এর ফলে ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য সংক্রান্ত আইন (Explosive Substance Act of 1908) প্রবর্তন করা হয়। এই আইনে বিস্ফোরক দ্রব্য রাখা ও ব্যবহার শুধু নিষিদ্ধই হয় নি, সমভাবেই দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষিত হয়। তবু প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত বোমা তৈরি ও ব্যবহার অব্যাহত গতিতেই চলে। বিস্ফোরক আইন প্রবর্তন দ্বারা বিপ্লবীদের বোমা তৈরি ও ব্যবহার কোন দিনই বন্ধ করা যায় নি।

অগ্নিযুগের উন্মেষকালের পরবর্তী অধ্যায়ে নানা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে পিক্রিক এসিড্ ধরনের বোমা ব্যবহৃত হয়। নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্র এ ধরনের বোমার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটত ; বিস্ফোরণের সাথে সাথেই বোমার খণ্ডাংশ বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ত।

১৯১০

মুন্সীগঞ্জ বোমার মামলা

১৯১০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ মহকুমার রাউথভোগ গ্রামে ললিত চৌধুরীর গৃহতল্লাসী কালে পুলিস এগারোটি শক্তিশালী তাজা বোমা ও বোমা তৈরির সঙ্কেত সূত্র (Formula) আবিষ্কার করে। ললিত চৌধুরী এবং আরও দু-জনকে গ্রেপ্তার করে ১৯০৮ সালের ৬নং বিস্ফোরক আইনের ৪ (খ) উপধারা [Explosive Substance Act VI of 1908,4 (b)] অনুসারে তাঁরা অভিযুক্ত হন। ললিত চৌধুরীর দশবৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়; অন্য দু-জন প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। এই মামলাই "মুন্সীগঞ্জ বোমার মামলা" নামে বিখ্যাত। এই মামলা চলা কালে জানা যায় যে ললিত চৌধুরী অনুশীলন সমিতির অন্যতম সক্রিয় সমর্থক এবং বোমাগুলো 'ঢাকা অনুশীলন সমিতির তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়। (৩৭)

১৯১১

ডালহৌসি স্কোয়ারে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা

১৯১১ সালের ২রা মার্চ ডালহৌসি স্কোয়ারে গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা ডেনহ্যাম (Denham) ভ্রমে মিঃ কাউলে (Mr Cowley) নামক জনৈক ইউরোপীয় ভদ্রলোকের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়; কিন্তু দৈবক্রমে বোমাটি বিস্ফোরণ না হওয়ায় ভদ্রলোক প্রাণে বেঁচে যান। মিঃ কাউলের প্রতি নিক্ষিপ্ত বোমাটি সুরেশচন্দ্র দত্তের পরিকল্পিত এবং চন্দননগর কেন্দ্রে তৈরি। এ সম্পর্কে নিম্নরূপ রিপোর্টের বিবরণ :

"Dalhousie Square Bomb outrage :

The name of Srish Ghosh again came up in connection with the Dalhousie Square Bomb outrage of 2nd March,

1911, which seems to be engineered by this party with the aid of one Jyotish Chandra Ghosh." (38)

নিক্সন রিপোর্টের এই তথ্য থেকে জানা যায় যে চন্দননগরের শ্রীশ ঘোষ কর্তৃক ডালহৌসি স্কোয়ারের বোমা নিক্ষেপের পরিকল্পনা রচিত হয় এবং অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ তাঁর সহায়তা করেন।

১৯১২

মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী আবদুল রহমানের গৃহে বোমা নিক্ষেপ

১৯১২ সালের ১৩ ডিসেম্বর মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী আবদুল রহমানকে হত্যার উদ্দেশ্যে তার গৃহে একটি শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করা হয়; কিন্তু বোমা নিক্ষেপ কালে আবদুল রহমান অন্যত্র থাকায় প্রাণে বেঁচে যায়।

বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ হত্যার পরিকল্পনা, আয়োজন ও বোমা সংগ্রহ

হার্ডিঞ্জ হত্যা পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক বড়লাটের প্রতি বোমা নিক্ষেপ দ্বারা বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরা যে বঙ্গভঙ্গ রদ দ্বারা ইংরেজের শান্তি প্রতিষ্ঠার নীতি ব্যর্থ; সুতরাং বোমা নিক্ষেপের লক্ষ্য বস্তু ভারতের ইংরেজ রাজ প্রতিনিধি বড়লাট—ব্যক্তিগত ভাবে লর্ড হার্ডিঞ্জ নয়।

হার্ডিঞ্জ হত্যার পরিকল্পনা রচনা ও বোমা সংগ্রহ বিষয়ে ক্ষীরোদ বাবুর মতে চন্দননগর কেন্দ্রেই শ্রীশচন্দ্র ঘোষের প্রস্তাব অনুসারে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ হত্যার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্যে বসন্ত বিশ্বাসকে সাথে নিয়ে রাসবিহারী চন্দননগর থেকে দিল্লী রওনা হন। লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতি নিক্ষিপ্ত বোমাটি চন্দননগর কেন্দ্রেই তৈরি হয়। বোমাটি তৈরি করেন শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত আর এর খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে তৈরির পূর্ণতা সাধন করেন অমৃতলাল হাজরা।

রাসবিহারীকে চন্দননগরে বোমাটি পৌঁছে দেন শ্রীনলিনচন্দ্র দত্ত। (৩৯)

অন্য সূত্র থেকে জানা যায় যে হার্ডিঞ্জ হত্যা প্রচেষ্টায় ব্যবহৃত বোমাটি চন্দননগরে মণীন্দ্রনাথ নায়েকের তত্ত্বাবধানে তৈরি হয় এবং জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ বোমাটি কলকাতায় রাসবিহারীর নিকট পৌঁছে দেন। (৪০)

বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ হত্যা প্রচেষ্টায় দিল্লীতে বোমা নিক্ষেপ

১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর মহাসমারোহে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের রাজকীয় শোভাযাত্রা দিল্লীতে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের নিকট পৌঁছামাত্র বড়লাটের প্রতি এক অতি বিস্ফোরক বোমা নিক্ষেপ করা হয়। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে বড়লাটের একজন দেহরক্ষী নিহত হয় এবং স্বয়ং বড়লাট নিক্ষিপ্ত বোমার টুকরায় আহত ও রক্তাক্ত কলেবরে হস্তিপৃষ্ঠে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। বড়লাটের শোভাযাত্রা মুহূর্তের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

এই বোমা বিস্ফোরণ সমর্থন করে দু-টি বৈপ্লবিক ইস্তাহার বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়; তন্মধ্যে প্রথমটি লালা হরদয়াল রচিত এবং প্যারিসে কৃষ্ণবর্মা কর্তৃক মুদ্রিত হয়ে পৃথিবীর নানা দেশে প্রেরিত হয়। ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই বৈপ্লবিক ইস্তাহার প্রচুর পরিমাণে ভারতে প্রেরিত ও প্রচারিত হয়। প্রথম এই ইস্তাহারটির শিরোনামা ছিল, "The Delhi Bomb." দ্বিতীয় ইস্তাহারটি দিল্লীতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের ঠিক এক বৎসর পর এই ঘটনার বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৯১৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বর "শাবাশ" শিরোনামায় বৈপ্লবিক ইস্তাহারটি প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। এখানে ঐ ইস্তাহার দু-টির প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা হল:

The Delhi Bomb

"This is the name we propose to give to the epoch-making, thought provoking, far resounding bomb of December, 23, 1912. One may say that it is one of the sweetest and loveliest bombs that have exploded in India since the great day of which Khudiram Bose first ushered a new era in the history of India, more than four years ago. Indeed this bomb is one of the most serviceable and successful bombs in the History of Freedom all over the world. Delhi has redeemed her ancient fame. She has spoken, and the world has heard and the tyrant has heard too ! And we, devoted soldiers of freedom in the country or abroad, have also heard the message," * * *

This bomb marks the definite revival of the Revolutionary movement after the short interval of inactivity that has been recently noticeable. * * *

"Who can describe the moral power of the bomb ? It is concentrated moral dynamite. When the strong and the cunning in the pride of their power parade their glory before their helpless victims, when the rich and the haughty set themselves on a pedestal and ask their slaves to fall down before them, when the wicked ones of the earth seem exalted to the sky and nothing appear to withstand their might, then in the dark hour, for the glory of humanity, comes the bomb, which lays the tyrant in the dust. It tells all the cowering slaves that he who sits enthroned as a god is a mere man like them. Then, in that hour of shame, the bomb preaches the eternal truth of human equality and sends proud Emperors and Viceroys from the palace and the howdah to the grave and to the hospital. Then, in that tense moment when human nature is ashamed of itself, the bomb declares the vanity of power and pomp, and redeems us from our own baseness. How great we feel when some one does a heroic deed ! We share in his moral power ; we rejoice in his assertion

of human equality and dignity. Deep down in the human heart, like a diamond in a mine, lies hidden the yearning for justice, equality and brotherhood. We do not even know it ourselves. And that is why we instinctively honour those who make war on inequity and injustice by any means in their power, the pen, the tongue, the sword, the gun, the strike, and last but not the least the Bomb." (৪১)

Sabash

"During the period of calamity there is nothing more useful for India than the bomb. It is the bomb that frighten the Government into conceding rights to the people. The chief thing is to frighten the Government."

* * * *

"The bomb is the messenger of mutiny, and the fear of mutiny is the correcting of Government, while a general mutiny will be means of its total annihilation. Without the bomb, slavery and poverty would have gone on increasing in India in the twentieth century, and there would have been no limit of oppression. But a voice proclaims from Paris now that the oppression is come to an end, for the bomb, the benefactor of the poor, has been brought across the seas; bow down to it in worship and sing its praise." (৪২)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাকালে প্রচারিত এই দু-টি বৈপ্লবিক ইস্তাহার থেকে বোমা সম্পর্কে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট হয়েছে। বিপ্লবীরা বোমাকে শুধু বিপ্লবের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে দেখেন নি; একে গ্রহণ করেছেন বিপ্লবের বার্তাবাহক অগ্রদূত রূপে। তাঁদের ধারণা যে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ বিদেশী শাসকের কর্ণকুহরে ভাবী বিপ্লবের সতর্ক বাণী; এতে হয়ত বিপ্লব-ভয়ভীত সন্ত্রস্ত শাসক নিজেকে সংশোধন করবে; আর বোমার

বৃহত্তর ভূমিকা হল সামগ্রিক বিপ্লবে বিদেশী শাসক শক্তির অবশ্যম্ভাবী পতন ঘটানো। তা না হলে ভারতের দাসত্ব ও দারিদ্র্যের অবসান সুদূর পরাহত।

১৯১৩

গর্ডন হত্যা প্রচেষ্টায় মৌলভিবাজারে বোমা নিক্ষেপ

১৯১৩ সালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল গর্ডন হত্যা প্রচেষ্টা।

রাসবিহারীর প্রস্তাব অনুসারে আসামের শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত মৌলভিবাজারের মহকুমা হাকিম (S.D.O) মিঃ গর্ডনকে হত্যার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে অনুশীলন সমিতির একনিষ্ঠ কর্মী যোগেন্দ্রনাথ (যোগীন্দ্রনাথ) চক্রবর্তী, অমৃতলাল সরকার ও তারাপ্রসন্ন বল সমিতির বাদুড়-বাগান কেন্দ্র থেকে বোমা নিয়ে মৌলভিবাজার অভিমুখে রওনা হন। শ্রীমতিলাল রায় রচিত "আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী" নামক পুস্তকেও এর উল্লেখ রয়েছে। ১৯১৩ সালের ২৭শে মার্চ মৌলভি-বাজারে মিঃ গর্ডনের (Mr Gordon) উপর বোমা নিক্ষেপের এক চেষ্টা হয়। দৈবক্রমে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং গর্ডন সাহেব প্রাণে বেঁচে যান। বোমা নিক্ষেপের পূর্বেই গর্ডন সাহেবের বাঙ্গলোয় প্রাচীর অতিক্রম কালে বোমাটি সহসা ফেটে যাওয়ায় যোগেন্দ্রনাথের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটে। অমৃতলাল সরকার ও তারাপ্রসন্ন বল গুরুতর আহত হওয়া সত্ত্বেও পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। যোগেন্দ্রনাথের দেহ তল্লাসী করে পুলিস কিছু কাগজ পত্র পায় এবং তা থেকে রাজাবাজার কেন্দ্রের হদিস পায়। নিরাপত্তার জন্য গর্ডন সাহেবকে লাহোরে বদলি করা হয়; কিন্তু সুদূর পাঞ্জাবেও তিনি বিপ্লবীদের আক্রমণের প্রসারিত হস্ত থেকে অব্যাহতি পান নি। লাহোরে তাঁর প্রাণনাশের নিমিত্ত দ্বিতীয়বার বোমা নিক্ষেপ

করা হয়। এবারেও বিপ্লবীদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়; গর্ডন সাহেব বেঁচে যান

রাণীগঞ্জে বোমা বিস্ফোরণ

১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে রাণীগঞ্জে পুলিস ষ্টেশনে রাজাবাজার শ্রেণীর এক শক্তিশালী প্রিক্রিক এসিড বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণের ফলে কেউ হতাহত হয়েছে কিনা তা জানা যায় নি।

দ্বিতীয়বার গর্ডন হত্যা প্রচেষ্টায় লাহোরে বোমা নিক্ষেপ

সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে গর্ডন হত্যার অভিপ্রায়ে ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে রাসবিহারী চন্দননগর থেকে কয়েকটি বোমা নিয়ে আসেন। এই তথ্য অনুসারে গর্ডন হত্যা প্রচেষ্টায় দ্বিতীয়বার যে বোমা নিক্ষেপের আয়োজন হয়, তা চন্দননগর কেন্দ্রের তৈরি এক অতি শক্তিশালী বোমা। এ সম্পর্কে সর্বশেষ সূত্র থেকে জানা যায় যে রাসবিহারীর নির্দেশমত আমিরচাঁদ ও অবোধবিহারী ১৭ই মে শনিবার লাহোর লরেন্স গার্ডেনে অবস্থিত ইউরোপীয় ক্লাব মণ্টগোমারী-হলে বোমা নিক্ষেপ করে মিঃ গর্ডন সহ বহু ইউরোপীয়ের প্রাণ সংহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে ১৬ই মে শুক্রবার অবোধবিহারী বসন্ত বিশ্বাসকে একটি বোমা দিয়ে বললেন যে পরদিন সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটার মধ্যে সে (বসন্ত বিশ্বাস) যেন লরেন্স গার্ডেনে আবোধ বিহারীর সাথে দেখা করে; তখন তাঁরা দুজনে মিলে বোমটিকে ঠিক ঠাক করে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে আসবেন। তদনুসারে পরদিন (১৭ই মে, শনিবার) সন্ধ্যায় তাঁরা দুজন লরেন্স গার্ডেনে মিলিত হলে বসন্ত বিশ্বাসের আনীত বোমাটিতে আবোধবিহারী ডিটোনেটর

(Detonator) সংযোজিত করে দেন। তারপর সমস্ত আয়োজন যথাযথ সম্পন্ন হলে বসন্তবিশ্বাস বোমাটি ইউরোপীয় ক্লাব মণ্টগোমারী হলে রাখার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থকাম হন, কারণ সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত ক্লাব গৃহে প্রবেশ করা বসন্তের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। তাই বসন্তবিশ্বাস ডিটোনেটর সংযোজিত বোমাটি অতি সন্তর্পণে লরেন্স গার্ডেনে পথের ধারে রেখে আসেন। এবারও গর্ডন সাহেব বরাত জোরে বেঁচে যান। বোমা বিস্ফোরণের ফলে গর্ডন সাহেব বা কোনও ইউরোপীয় হতাহত হয় না ; নিহত হয় রামপদার্থম্ নামক এক হতভাগ্য চাপরাশি। (৪৩)

বোমা নিক্ষেপে পুলিস ইন্সপেক্টর বঙ্কিম চৌধুরী হত্যা

১৯১৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহের পুলিস ইন্সপেক্টর বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী রাজাবাজার শ্রেণীর অতি মারাত্মক পিক্রিক এসিড বোমায় নিহত হয়। বোমাটি নিক্ষেপ করেন মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ

রাজাবাজার শ্রেণীর বোমা ও তার গুরুত্ব

কলকাতার রাজাবাজার অঞ্চলে ২৯৬।১ আপার সার্কুলার রোডে অনুশীলন সমিতির একটি কেন্দ্র ছিল। অমৃতলাল হাজরা ওরফে শশাঙ্ক ওখানেই থাকতেন। অনুশীলন সমিতির এই কেন্দ্রই রাজাবাজার কেন্দ্র নামে অভিহিত হত। ১৯১৩ সালের ২২শে নভেম্বর রাজাবাজার কেন্দ্র খানাতল্লাসী করে পুলিস কতকগুলো অতি মারাত্মক ধরনের পিক্রিক এসিড বোমা পায়। বোমার খোল-গুলো কাষ্ট আয়রণের বা ঢালাই লোহার তৈরী। ঐ দিন ঐ কেন্দ্র থেকে অমৃতলাল হাজরা সহ কয়েকজন গ্রেপ্তার হন। পুলিসের ধারণা বোমাগুলো অমৃতলাল হাজরার তৈরী। এরপর সুরু হল রাজাবাজার ষড়যন্ত্র মামলা। এই মামলার রায়দান প্রসঙ্গে বিচারক-

গণ অভিমত প্রকাশ করেন যে অমৃতলাল হাজরার তৈরি এই ধরনের বোমা ভারতের নানা স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে এই শ্রেণীর বোমার ব্যবহার সম্পর্কে কলিকাতা হাইকোর্টে রাজাবাজার ষড়যন্ত্রের আপিল মামলার রায় প্রদান প্রসঙ্গে ১৯১৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখার্জী এবং রিচার্ডসন সাহেব (Mr T. W. Richardson) মন্তব্য করেন:

"The circumstances that bombs of this particular type have been used in various places in British India as widely spread from Lahore, Delhi, Sylhet, Mymensingh and Midnapore points to the conclusion that more than one person is engaged in these transactions. The bombs are not the handiwork of one individual though may be work of one controlling hand."

ভদ্রেশ্বরে বোমা বিস্ফোরণ

১৯১৩ সালের ৩০শে ডিসেম্বর (মতান্তরে ৩১শে ডিসেম্বর) ভদ্রেশ্বর থানায় রাজাবাজার শ্রেণীর এক অতি বিস্ফোরক বোমার বিস্ফোরণ ঘটে।

১৯১৪

বসন্ত চ্যাটার্জির হত্যা প্রচেষ্টায় বোমা নিক্ষেপ

১৯১৪ সালের ২৫শে নভেম্বর অনুশীলন সমিতির কয়েকজন বিপ্লবী সদস্য কলকাতায় গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বসন্ত চ্যাটার্জির মুসলমান পাড়া লেনের সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত সুরক্ষিত বসতবাড়ীর বৈঠকখানায় অতি বিস্ফোরক বোমা নিক্ষেপ করেন। বসন্ত চ্যাটার্জি কয়েক সেকেণ্ড পূর্বে উঠে যাওয়ায় সে যাত্রা রক্ষা পায়, কিন্তু প্রহরারত জনৈক হেড্ কনেষ্টবল নিহত হয়, আহত হয় দু'জন কনেষ্টবল ও বসন্ত চ্যাটার্জির জনৈক আত্মীয়। সতীশ পাকড়াশী এবং আরও কয়েকজন বিপ্লবীও অল্পবিস্তর আহত হন; কিন্তু সৌভাগ্য-

ক্রমে তাঁরা ধরা পড়েন নি। জানা যায় যে প্রচণ্ড শক্তিশালী রাজাবাজার শ্রেণীর এই বোমাটি প্রফুল্ল বিশ্বাস চন্দননগর কেন্দ্র থেকে নিয়ে আসেন।

১৯১৫
পাঞ্জাবের নানাস্থানে খানাতল্লাসীতে বোমা প্রাপ্তি

১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সর্বভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরিকল্পনার সংবাদ পূর্বেই জানতে পেরে পুলিস দিল্লী ও পাঞ্জাবের নানাস্থানে খানাতল্লাসী করে প্রচুর সংখ্যক বোমা ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্রের সন্ধান পায়।

মিরাট ক্যাণ্টনমেণ্টে বোমা সহ পিংলের গ্রেপ্তার

১৯১৫ সালের ২৩শে মার্চ মহানায়ক রাসবিহারীর অন্যতম বিশ্বস্ত সহচর বিষ্ণু গণেশ পিংলে মিরাটে ১২নং অশ্বারোহী (12th Cavalry) সৈন্য ব্যারাকে দশটি অতি বিস্ফোরক মারাত্মক বোমা সহ গ্রেপ্তার হন। পিংলের নিকট প্রাপ্ত দশটি বোমা সম্পর্কে ভারত সরকারের বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞগণের অভিমত, "Sufficient to annihilate half a regiment" অর্থাৎ অনায়াসে অর্ধেক রেজিমেণ্ট নিশ্চিহ্ন করার পক্ষে এই দশটি বোমাই যথেষ্ট।

মণীন্দ্রনাথ নায়েকের তৈরি এই বোমা দশটি মন্মথনাথ বিশ্বাস চন্দননগর থেকে বেনারস নিয়ে যান; বেনারসে রাসবিহারীর কাছ থেকে এই বোমা দশটি নিয়ে পিংলে মিরাট যান। এ সম্পর্কে অধ্যাপিকা উমা মুখার্জির বিবরণ:—

"It has been learnt by the present writer from Manindra Nath Naik of Chandannagore, that the ten Meerat bombs were manufactured at Chandannagore and thence brought to Benares by Manmath Nath Biswas." (88)

১৯১৬

খড়দহে বোমা প্রাপ্তি

১৯১৬ সালের ৯ই এপ্রিল খড়দহে শেখ ছমিরের বাগানবাড়িতে রাজাবাজার শ্রেণীর দু-টি অতি বিস্ফোরক বোমা পাওয়া যায়। পুলিস বোমা দু-টি নিয়ে যায়।

১৯২৩

ধন্না সিং-এর বোমা বিস্ফোরণ

বাব্বর আকালী দলের ধন্না সিং ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে পুলিসের হাতে ধরা পড়ার পর স্বীয় পরিচ্ছদের অন্তরালে লুক্কায়িত অতি বিস্ফোরক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজেও নিহত হন এবং সাথে সাথে মৃত্যু ঘটান শ্বেতাঙ্গ পুলিস কর্মচারী সহ আরও ছ-জন পুলিসের।

১৯২৪

দ্বিতীয় মানিকতলা বোমার মামলা

১৯২৪ সালের মার্চ মাসে মানিকতলার ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউট্ স্ট্রীটের যশোদারঞ্জন পালের গৃহ খানাতল্লাসী কালে একটি ট্রিগার-টাইপের (Trigger type) বোমা পাওয়া যায়। মানিক-তলায় প্রাপ্ত এই বোমার আকার ও গঠনের সাথে দক্ষিণেশ্বরে প্রাপ্ত বোমার আকার ও গঠনের বেশ সাদৃশ্য ছিল। এই বোমা প্রাপ্তি সম্পর্কে যশোদারঞ্জন পাল, অবনী চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ ও সন্তোষ মিত্রকে (পরবর্তী কালে হিজলী বন্দীশালায় পুলিসের গুলিতে নিহত) গ্রেপ্তার করা হয়। এদের অভিযুক্ত করে যে মামলা সুরু হয়, তা দ্বিতীয় মানিকতলা ষড়যন্ত্র মামলা বা দ্বিতীয় মানিকতলা বোমার মামলা নামে বিখ্যাত। এই মামলায় যশোদা-রঞ্জন পাল ও অবনী চক্রবর্তী যথাক্রমে দশ বৎসর ও সাত বৎসর-

সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রমাণাভাবে গণেশ ঘোষ ও সন্তোষ মিত্র মুক্তি পান।

নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে মানিকতলায় প্রাপ্ত ট্রিগার টাইপ বোমাটি ছিল গণেশ ঘোষের তৈরি। তিনি সে সময়ে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র ছিলেন। কলেজের কারখানার জনৈক মিস্ত্রিকে দিয়ে তিনি অনেকগুলো কাষ্ট আয়রণের (Cast Iron) অর্থাৎ ঢালাই লোহার খাঁজকাটা বোমার খোল তৈরি করিয়ে নেন; পরে ঐ মিস্ত্রির কাছ থেকে বোমার খোল তৈরি শিখে নিয়ে বহু খোল নিজেরা তৈরি করেন। কিছু অন্য উপায়ে সংগ্রহ করেন। পরে বোমা তৈরির উদ্দেশ্যে এই খোলগুলো নানা স্থানের বৈপ্লবিক কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়।

১৯২৫

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা

১৯২৫ সালের ১০ই নভেম্বর দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতি পাড়ায় একটি দোতলা বাড়ি খানাতল্লাসী করে পুলিস একটি মারাত্মক ধরনের তাজা বোমা, একটি পিস্তল ও ৯৩টি তাজা কার্তুজ পায়। এ থেকে সুরু হয় বিখ্যাত দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা। ঐদিন ৪নং শোভাবাজার ষ্ট্রীটের বিপ্লবীদের আস্তানায় খানাতল্লাসী হয়। ভূপেন চ্যাটার্জী হত্যা মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অনন্তহরি মিত্র শোভাবাজার ও দক্ষিণেশ্বর এই উভয় কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়ে পুলিস দক্ষিণেশ্বরের আস্তানার সন্ধান পায়। সেখানে গ্রেপ্তার হন অনন্তহরি মিত্র, রাজেন্দ্রনাথ (রাজেন্দ্র-লাল) লাহিড়ী, হরিনারায়ণ চন্দ প্রভৃতি, আর শোভাবাজার কেন্দ্রে গ্রেপ্তার হন ভূপেন চ্যাটার্জী হত্যা মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী এবং অন্যান্য আরও কয়েকজন। মাষ্টারদা সুর্যসেন তখন শোভাবাজাব কেন্দ্রে ছিলেন; ধরা পড়তে পড়তে

কোনক্রমে পুলিসের চোখে ধূলি দিয়ে তিনি পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। পুলিস রিপোর্ট ও বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত রাজেন লাহিড়ী কলকাতার বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে দক্ষিণেশ্বরের কেন্দ্র থেকে বোমা তৈরি শেখার এবং যুক্তপ্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশের) জন্য বোমা সংগ্রহের অভিপ্রায়ে ১৯২৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর কলকাতা রওনা হন। পুলিস তখন তাঁকে কাকোরী ট্রেন ডাকাতির সাথে সংশ্লিষ্ট সন্দেহে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কাকোরী ষড়যন্ত্রের নায়ক রামপ্রসাদ বিস্‌মিলের বোমা সংগ্রহের জন্য কলকাতা আসার কথা থাকলেও নানা কারণে তা হয়ে ওঠে নি। অন্যান্য অভিযুক্তদের সাথে রাজেন লাহিড়ী দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন; পরে তাঁকে কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ ডাঃ রবসনের প্রতিবেদনে দক্ষিণেশ্বরে প্রাপ্ত বোমাটির কয়েকটি বিশেষত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রথমত :, প্রায় এক বৎসর পূর্বে মানিকতলায় প্রাপ্ত বোমার সাথে দক্ষিণেশ্বরের বোমার অবিকল সাদৃশ্য। এ থেকে খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে বোমা তৈরি বিষয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রের সংযোগ ছিল; তা না হলে উভয় কেন্দ্রের বোমার এরূপ সাদৃশ্য খুবই বিস্ময়কর।

দ্বিতীয়ত :, বোমাটি মারাত্মক ধরনের একটি তাজা বোমা।

তৃতীয়ত :, খাঁজকাটা কাষ্ট আয়রণের খোল থাকায় বিস্ফোরণের সাথে সাথে ঐ খোল অজস্র খণ্ডাংশে (splinters) বিভক্ত হয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে মারাত্মক আঘাত সৃষ্টি করতে পারত।

চতুর্থত :, খোলের অভ্যন্তরের বিস্ফোরক পদার্থ অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের ছিল।

পঞ্চমত :, বোমাটির খাজকাটা কাষ্ট আয়রণ বা ঢালাই লোহার

খোলের ওজন ছিল ১ পাউণ্ড দশ আউন্স (অর্থাৎ আধ সেরের কিছু উপরে) এবং ভেতরের বিস্ফোরক পদার্থের ওজন ৩'৫ আউন্স। সুতরাং বোমাটি ওজনে বেশ ভারী ছিল।

ষষ্ঠত :, রাসায়নিক উপায়ে বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটানো হোত। সুতরাং এটি একটি উন্নতমানের বোমা ছিল। (৪৫)

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার অন্যতম সাক্ষী ভারত সরকারের বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ Dr. William Pawson Robson (P. W. 2) জেরার উত্তরে যে বিবৃতি প্রদান করেন তার অংশবিশেষ :—

"The bomb was a live and completed by itself" (৪৬)

—"বোমাটি তাজা এবং সম্পূর্ণ।

"I conclude that the mixture was sensitive." (৪৭)

—"মিশ্রণটি খুবই সক্রিয় ছিল বলে আমি সিদ্ধান্ত করছি।"

দক্ষিণেশ্বরে প্রাপ্ত বিস্ফোরক পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই বিবৃতিতে তাঁর মন্তব্য :—

"With the chemicals found in the house, Gun cotton, Nitro-glycerine and fulminate of Mercury could be made." (৪৮)

এই মন্তব্য থেকে জানা যায় যে দক্ষিণেশ্বরে বোমা ব্যতীত যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায় তা দিয়ে গান কটন, নাইট্রো-গ্লিসারিন্ এবং বিস্ফোরণশীল পারদ তৈরি করা যায়।

এই প্রসঙ্গে তাঁর আরও মন্তব্য :—

"সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিড বিস্ফোরক ও রাসায়নিক পদার্থ তৈরির প্রধান উপকরণ। মানিকতলায় প্রাপ্ত বোমাগুলো ট্রিগার টাইপ ধরনের ছিল। বোমাগুলো তাজা ছিল এ কথা মনে করার পক্ষে আমার যুক্তি এই যে ভেতরের লোহার উপরিভাগে আয়রণ পিক্রেট্ নামক রাসায়নিক পদার্থের কোনও চিহ্ন ছিল না।" (৪৯)

১৯২৮

মানমদ স্টেশনে বোমা বিস্ফোরণ

১৯২৮ সালের ৮ই অক্টোবর মানমদ স্টেশনের নিকট একটি এক্সপ্রেস ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় প্রচণ্ড এক বোমা বিস্ফোরণের ফলে তিনজন যাত্রী নিহত এবং আটজন যাত্রী আহত হন। আহতদের মধ্যে বেনারসের হরেন্দ্রদেব ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করা হয়; পরে গ্রেপ্তার হন বেনারসের মনোমোহন ও বীরেশ্বর গুপ্ত। এঁরা দু-জনে বোমা বহনকারী বলে অভিযুক্ত হন এবং বিচারে প্রত্যেকে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এঁরা হিন্দুস্থান রিপাবলিকান্ আর্মির (H. R. A) সভ্য ছিলেন। প্রকাশ পায় যে সাইমন কমিশনের সদস্যদের হত্যার উদ্দেশ্যে এই বোমা নিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

১৯২৯

দিল্লী-পরিষদ গৃহে বোমা নিক্ষেপ

স্যাণ্ডার্স হত্যার পর ভগৎ সিং লাহোর পরিত্যাগ করে কলকাতা চলে আসেন এবং ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন কালে তিনি বাঙ্গলার বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ করে পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের জন্য কিছু বোমা ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেন।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে ভগৎ সিং কলকাতা এসে ৭৯ বি আপার সার্কুলার রোডে (79 B Upper Circular Road) মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলি ও রবীন্দ্রমোহন সেন প্রমুখ অনুশীলন সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করে পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক সংগঠনের জন্য তাঁদের কাছে কিছু বোমা ও রিভলবার সরবরাহের জন্য অনুরোধ জানান। তাঁরা তাঁকে বলেন যে ইতস্তত

বিক্ষিপ্ত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড ভবিষ্যতের বৃহত্তর বিপ্লব আয়োজন ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রস্তুতির পথে অন্তরায় হতে পারে বলে তাঁদের ধারণা; সুতরাং এ ধরনের কার্যকলাপ তাঁদের মনঃপূত নয়। প্রত্যুত্তরে ভগৎ সিং দিল্লী-পরিষদ ভবনে বোমা নিক্ষেপের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁদের সাথে আলোচনা করেন। তিনি অনুশীলন সমিতির নেতৃবৃন্দকে এই কথা বুঝিয়ে বলেন যে পরিষদ ভবনে বোমা নিক্ষেপের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা ব্যক্তি হত্যার উদ্দেশ্যে নয়; কারও প্রাণহানি করার ইচ্ছাও তাঁদের নাই; শুধু ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস হিসাবে তাঁরা দিল্লীতে পরিষদ ভবনে বোমা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অনুশীলন সমিতির নেতৃবৃন্দ তাঁর যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করে তাঁকে দু-টি রিভলবার প্রদান করেন; আর পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের জন্য বোমা তৈরি ও তার কৌশল শিখিয়ে দেবার জন্য যতীন দাসকে পাঞ্জাবে প্রেরণ করেন। যতীন দাস এই সময় কলকাতায় বোমা তৈরি সম্পর্কে নানারূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন; সুতরাং তাঁকেই উপযুক্ত বিবেচনা করে পাঠানো হল।

এরপর লাহোরের ৬৯ নং ম্যাকলিয়ড্ রোডে অবস্থিত কাশ্মীরী বিল্ডিং-এ এবং সাহারাণপুরে বোমা তৈরির ব্যবস্থা হল।

অবশেষে ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল যতীন দাসের তৈরি দু-টি বোমা নিয়ে ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্ত দর্শকের গ্যালারীতে উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। জন নিরাপত্তা আইনের খসড়া (Public Safety Bill) এবং চা ব্যবসায়ীর বিরোধ সংক্রান্ত আইনের খসড়া (Tea Traders' Disputes Bill) সম্পর্কে আলোচনা চলাকালে দু-জন বিপ্লবী দর্শকের গ্যালারী থেকে পরিষদ ভবনের মেঝেতে বোমা নিক্ষেপ করলেন। সহসা বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে কর্ণ বধির হওয়ার উপক্রম হল; সকলে হতচকিত হয়ে ছুটে পালাতে লাগল। বোমা দু-টি খুব মারাত্মক

ছিল না বলে কেউ হতাহত হয় নি। বিপ্লবীরা কারও প্রাণহানি করতে চান নি; তাঁরা এই বোমা বিস্ফোরণ দ্বারা শুধুমাত্র নিজেদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে জন নিরাপত্তা বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছিলেন। প্রাণহানির উদ্দেশ্য থাকলে তাঁরা এর চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালী বোমা ব্যবহার করতে পারতেন।

দিল্লীতে পরিষদ ভবনে বোমা বিস্ফোরণের পর পুলিস খুব সচকিত ও তৎপর হয়ে উঠল; নানা স্থানে জোর খানাতল্লাসী সুরু হল। বিভিন্ন সূত্র থেকে সন্ধান পেয়ে পুলিস ১৫ই এপ্রিল ৬৯ নং ম্যাকলিয়ড্ রোডে অবস্থিত কাশ্মীরী বিল্ডিং-এ বিপ্লবীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র খানাতল্লাসী করে রিভলবার, পিস্তল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র এবং প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক পদার্থ ও বোমা তৈরির উপকরণ, বৈপ্লবিক ইস্তাহার, রাজদ্রোহকর পুস্তক ও বহু আপত্তিকর কাগজপত্র আবিষ্কার করে। ১৩ই মে পুলিস সাহারাণপুরের কর্মকেন্দ্রে হানা দিয়েও প্রচুর পরিমাণে বোমা তৈরির বিবিধ উপকরণ হস্তগত করে।

ভুসাওয়াল বোমার মামলা

১৯২৯ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর ভগবান দাস ও সদাশিব রঘুনাথ ভুসাওয়াল (Bhusawal) রেল স্টেশনে জনৈক পুলিস কনেষ্টবলের প্রতি গুলি বর্ষণ করে পলায়ন কালে ধৃত হন। তাঁদের কাছে দু-টি রিভলবার,তিনটি বোমা ও কিছু কার্তুজ পাওয়া যায়। এই নিয়ে যে মামলা হয় তা ভুসাওয়াল বোমার মামলা নামে খ্যাত।

মেছুয়াবাজার বোমার মামলা

১৯২৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর পুলিস কলকাতার মেছুয়াবাজার খানাতল্লাসী করে বোমা তৈরির ফর্মুলা এবং সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন, জগদীশ চ্যাটার্জি প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন সুধাংশু দাসগুপ্ত বোমা ও রিভলবার সহ গ্রেপ্তার হন। এই বোমাটিও

মারাত্মক ধরনের ছিল। এরপর পুলিস সন্দেহক্রমে আরও কয়েকটি বাড়ি খানাতল্লাসী করে বোমা তৈরির সাজসরঞ্জাম এবং উপকরণ সহ আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। এর পর স্বরু হয় মেছুয়া-বাজার বোমার মামলা। একটা বিস্ময় কিন্তু বেশ লক্ষ্য করার। বোমা সম্পর্কে বোধ হয় কর্তৃপক্ষের একটু বেশী মাত্রায় স্পর্শ কাতরতা ছিল; কারণ দক্ষিণেশ্বরে, ভুসাওয়ালে ও মেছুয়াবাজারে বোমা, পিস্তল ও রিভলবার পাওয়া গেলেও বোমাকেই প্রাধান্য দিয়ে এ সব স্থানের মামলাগুলোকে বোমার মামলা নামে অভিহিত করা হয়েছে।

১৯৩০

আকস্মিক বোমা বিস্ফোরণ
ভগবতী চরণ ভোরার মৃত্যু।

শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে বড়লাটের ট্রেন ধ্বংস করার এবং পরিষদ ভবনে বোমা বিস্ফোরণের মামলায় অভিযুক্ত সর্দার ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তকে পুলিসের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার এক ষড়যন্ত্র হয় এবং সে বিষয়ে প্রস্তুতিও চলে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এক দুর্ঘটনার ফলে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী রাভি নদীর তীরে এক নির্জন অরণ্যে বোমার কার্যকারিতা পরীক্ষা কালে হঠাৎ বোমার সেফ্‌টি (safety) বিকল হওয়ায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে এবং এই বিস্ফোরণের ফলে হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাব্‌লিকান্ আর্মি (H. S. R. A) এবং অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সক্রিয় সদস্য ভগবতী চরণ ভোরা গুরুতর আহত হয়ে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হন।

অমৃতসর খালসা কলেজে বোমা বিস্ফোরণ

১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী অমৃতসর খালসা কলেজের অধ্যক্ষ ছাত্রদের দ্বারা আয়োজিত স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে বাধা প্রদান করায় ২২শে ফেব্রুয়ারী উক্ত অধ্যক্ষকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার

উদ্দেশ্যে উক্ত কলেজে এক অতিবিস্ফোরক বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এই বোমা বিস্ফোরণের ফলে একজন নিহত ও এগারোজন আহত হয়।

চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহে বোমার ভূমিকা

চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ ভারতীয় বিপ্লববাদের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের এই যুব বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ বহ্নির একটি স্ফুলিঙ্গের আত্ম প্রকাশ ঘটে। চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার সমূহ আক্রমণ কালে যদিও বোমা ব্যবহৃত হয় নি, তবু আক্রমণ পরবর্তী বিপ্লবীদের পরিত্যক্ত বোমাগুলো থেকে প্রমাণ হয় যে তাঁদের সাথে বোমা ছিল। প্রাক্-অভ্যুত্থান প্রস্তুতি পর্বে যথেষ্ট বোমা তৈরি হয়। শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধে, হাতাহাতি যুদ্ধে বা পলায়নকালে বোমার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই বিপ্লবীরা সাথে কিছু বোমা নিয়েছিলেন ; পরে প্রয়োজন না থাকায় এবং দ্রুত স্থান ত্যাগকালে সাথে বোমা নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক ও অসুবিধাকর বিবেচনা করে তাঁরা ওগুলি ফেলে রেখে যান। সরকারী প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে এই বোমাগুলো খুব মারাত্মক এবং এগুলোর ধরন অনেকটা দক্ষিণেশ্বরে প্রাপ্ত বোমার অনুরূপ।

পুলিশ অস্ত্রাগার আক্রমণের পরদিন অর্থাৎ ১৯শে এপ্রিল বিপ্লবীদের পরিত্যক্ত অনন্ত সিং-এর নিজস্ব বেবি অষ্টিন গাড়ি (car No.-24666) খানাতল্লাসী করে পুলিস সরকারী অস্ত্রাগারের সাতটি পুলিস মাস্কেট ও সাতটি বেয়নেট (Exhibis. DLXIV) এবং দু-টি টিনের ছোট অ্যাটাচি কেস (Exhibits DLXXII and DL XIII) পায়। এ গুলির একটিতে ছিল চারটি আর অন্যটিতে ছিল তিনটি তাজা বোমা। [Exhibits LXIII, CC XIX (4) to (9)]।

ঐ দিন A.F.I. অস্ত্রাগারে বিপ্লবীদের পরিত্যক্ত অন্যান্য জিনিসের মধ্যে একটি কাঠের বাক্সে চারটি টিনে কিছু ডিটোনেটর ও তিনটি বোমা পাওয়া যায়। [Exhibits CC XIX (1) to (3)]।

জালালবাদ যুদ্ধের পরদিন পুলিস রণক্ষেত্রের অদূরে বিপ্লবীদের পরিত্যক্ত একটি বোমা কুড়িয়ে পায়। (৫০)

বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ মিঃ শেলডনের মতে উপরোক্ত ১১টি বোমা শক্তিশালী এবং মারাত্মক। প্রত্যেকটি বোমারই সিলিণ্ডার বা খোল আড়াআড়িভাবে খাঁজকাটা কাষ্ট আয়রণে তৈরি; বিস্ফোরণের ফলে বোমার বত্রিশটি বা তার চেয়ে বেশী খণ্ডাংশ বুলেটের মত বেগে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। (৫১)

শেলডেন সাহেব এগারোটি বোমার মধ্যে একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করেন; বাকী দশটিও তাজা বোমা ছিল। এর মধ্যে সাতটি বোমা অ্যামোনিয়াম পিক্রেট এবং পটাসিয়াম ক্লোরেট নামক বিস্ফোরক পদার্থের মিশ্রণে পরিপূর্ণ ছিল; আর বাকী তিনটি বারুদে পরিপূর্ণ ছিল। অ্যামোনিয়াম পিক্রেটের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সামর্থ্য থাকায় পটাসিয়াম ক্লোরেটের সাথে এর মিশ্রণের ফলে তৈরি বিস্ফোরকের বিস্ফোরণ ক্ষমতা প্রচণ্ডতর। সুতরাং অ্যামোনিয়াম পিক্রেট ও পটাসিয়াম ক্লোরেট্ পরিপূর্ণ সাতটি বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতা বারুদ পরিপূর্ণ তিনটি বোমার চেয়ে ঢের বেশী ছিল বলেই এই সাতটি বোমা ছিল অধিকতর শক্তিশালী। ফিউজ সংলগ্ন করে বোমাগুলোর বিস্ফোরণ করতে মাত্র তিন সেকেণ্ড থেকে আট সেকেণ্ড সময় লাগত।

উল্লেখ্য দক্ষিণেশ্বরে প্রাপ্ত বোমাটিও ফিউজ সংলগ্ন ছিল এবং খানাতল্লাসীকালে রাজেন লাহিড়ী এ বিষয়ে ডাকফিল্ড (Mr. Duckfield) সাহেবকে সাবধান করে দেন। শেলডন সাহেবের মত দক্ষিণেশ্বরের বোমার সাথে এই বোমাগুলোর পার্থক্য নেই;

পরন্তু এগুলোর সাতটি বোমা এবং দক্ষিণেশ্বরের বোমা একই হাতের তৈরি বলে তিনি মনে করেন।

ডালহৌসী স্কোয়ারে টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টায় বোমা বিস্ফোরণ।

২৫শে আগষ্ট প্রকাশ্য দিবালোকে ডালহৌসী স্কোয়ারের ন্যায় জনাকীর্ণ স্থানে কলকাতার পুলিস কমিশনার স্যার চার্লস্ টেগার্টের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। টেগার্ট সাহেব প্রাণে বেঁচে যান; কিন্তু বিস্ফোরণের ফলে গুরুতর আহত বিপ্লবী অনুজা সেন ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন এবং আহত বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার ঘটনাস্থলের অদূরে ধরা পড়েন। অনুজা সেন এবং দীনেশ মজুমদার যুগান্তর দলভুক্ত। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে অ্যালুমিনিয়ম সেলের শক্তিশালী অতিবিস্ফোরক এই টি. এন. টি. (TNT) বোমাটি ডালহৌসী স্কোয়ার মামলায় অভিযুক্ত ডাঃ নারায়ণ রায়ের উদ্যোগে তৈরি হয়। এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা কেন্দ্র করেই ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলার সূত্রপাত হয়।

বড়লাটের ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টা

১৯৩০ সালের ২৩ শে নভেম্বর বড়লাটের ট্রেন ধ্বংসের উদ্দেশ্যে রেলপথের উপর একটি বোমা রাখা হয়। যথাসময়ে বিস্ফোরণ ঘটে এবং বড়লাটের ডাইনিং কারটি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু বড়লাট স্বয়ং অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পান।

চট্টগ্রামে ডিনামাইট ষড়যন্ত্র

১৯৩১ সালে ডিনামাইট ও ল্যাণ্ড মাইনের সাহায্যে জেলের দেওয়াল ভেঙ্গে বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তিকল্পে এবং ল্যাণ্ড মাইনের সাহায্যে আদালত সহ শহরের প্রধান প্রধান সরকারী ভবনের ধ্বংস

সাধন উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে এক ষড়যন্ত্র হয়। এই ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা রূপায়ণের নিমিত্ত অনন্ত সিং-এর দিদি শ্রীমতী ইন্দুমতী সিংহ কর্তৃক আগরতলা সরকারী অস্ত্রাগার থেকে বিদেশে তৈরি অতি শক্তিশালী ২৪টি ডিনানাইট ষ্টিক (Dynamite Stick) সংগৃহীত হয়; তন্মধ্যে ১২টি ষ্টিক ব্লুমফিল্ড (Bloom field) ও রাইট Wright) নামক দু-জন ইউরোপীয় সার্জেন্টের মাধ্যমে জেলের মধ্যে প্রেরিত হয়। ল্যাণ্ডমাইনগুলো বিপ্লবীরা নিজেরাই তৈরি করেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৩১ সালের মে মাসের মাঝামাঝি জেলের ভিতর ডিনামাইট ও বিস্ফোরক পদার্থ ধরা পড়ে যাওয়ায় বিপ্লবী বন্দীদের জেল ভেঙ্গে পলায়নের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় আদালত ও অন্যান্য সরকারী ভবন উড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে যায় ১৯৩১ সালের ৩রা জুন। এর ফলশ্রুতি হোল ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের চট্টগ্রাম ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা।

পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণে বোমার ভূমিকা

পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণ এই বৎসরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মাষ্টারদার নির্দেশিত পরিকল্পনা অনুসারে শ্রীমতী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে বোমা ও পিস্তল সজ্জিত বিপ্লবীরা ২৪শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে পাহাড়তলীর ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করেন। প্রথমেই বোমা ছুঁড়ে প্রহরারত রক্ষীদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। এরকম বড় আক্রমণে বোমার কার্যকারিতা সংশয়াতীত রূপে প্রমাণিত হয়েছে। ভয় বিহ্বল কিংকর্তব্যবিমূঢ় ক্লাবে সমবেত শ্বেতাঙ্গ বীরপুঙ্গবগণ প্রতিরোধের পরিবর্তে পলায়ন করে। বোমার পরিবর্তে শুধুমাত্র পিস্তল বা রিভলবারের সাহায্যে আক্রমণ চালালে দ্রুত এরূপ অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা হয়ত সম্ভবপর নাও হতে পারত। এই আক্রমণে বহু ইউরোপীয় নরনারী হতাহত হয়; সরকারী সংবাদে হতাহতের সঠিক সংবাদ প্রদান করা হয় নি;

সরকারী সংবাদে শুধু বলা হয় যে এই আক্রমণে শুধু মিস্ সুলিভাল নাম্নী জনৈক শ্বেতাঙ্গ মহিলা নিহত হন এবং কয়েকজন আহত হয়। সাফল্যের সাথে বিপ্লবীরা নির্বিঘ্নে ফিরে আসেন; কিন্তু অভিযান শেষে নেত্রী প্রীতিলতা বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

এই আক্রমণে ব্যবহৃত বোমাগুলো সম্পর্কে অন্যতম আক্রমণকারী শ্রীকালীকিঙ্কর দের কাছ থেকে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা নিম্নে প্রদত্ত হল:

পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণে ছ-টি প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমা নিয়ে যাওয়া হয়। এই ছ-টি বোমার মধ্যে দু-টি ছিল ডাঃ নারায়ণ রায়ের তৈরি অ্যালুমিনিয়ম খোলের, অন্য চারটি বোমা ছিল কাষ্ট আয়রণের ৩২টি খাঁজকাটা খোলের striker fitted ট্রিগার টাইপের (Trigger type) বোমা। ট্রিগারহীন কাষ্ট আয়রণের খোলের বোমা আছে, তবে ঐ বোমাগুলোতে ট্রিগার ছিল।

এই ছ-টি বোমা ছাড়াও পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণকালে বিপ্লবীদের সাথে নিজেদের তৈরি দু-টি টাইম বোমাও ছিল। আক্রমণ শেষে ফিরে আসবার সময় ওঁরা বোমা দুটি ক্লাবে রেখে আসেন।

১৯৩৩

রয়াপুরমে বোমা বিস্ফোরণ

১৯৩৩ সালের ১লা মে মাদ্রাজের রয়াপুরম্ নামক স্থানে বোমা বিস্ফোরণের ফলে রোশনলাল নামক জনৈক বিপ্লবী নিহত হন।

১৯৩৪

চট্টগ্রামে খেলার মাঠে ইউরোপীয়দের উপর আক্রমণ

১৯৩৪ সালের ৭ই জানুয়ারী চট্টগ্রামে ক্রিকেট খেলার মাঠে ইউরোপীয়ানদের আক্রমণকালে দু-টি অ্যালুমিনিয়াম খোলের বোমা

এবং আর্মি রিভলবার [Welby Revolber 455 (Mark VI] ব্যবহৃত হয়; এই ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা সম্পর্কে কোনও সরকারী তথ্য জানা যায় নি; তবে এই আক্রমণের ফলে বেশ কিছু ইংরেজ নরনারী হতাহত হয়। পুলিসের পালটা গুলিবর্ষণে বিপ্লবী-দের মধ্যে নিত্য সেন ও হিমাংশু চক্রবর্তী ঘটনাস্থবেই মৃত্যুমুখে পতিত হন; আহত অবস্থায় ধরা পড়েন শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন্দ্র ভট্টাচার্য; পরে বিচারে এঁদের প্রাণদণ্ড হয়।

বোমার গুরুত্ব সর্বজন স্বীকৃত হলেও তৈরি, বহন, নিক্ষেপ, উপকরণ সংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে কতকগুলো অসুবিধা থাকায় পরবর্তীকালে বিপ্লবীরা বোমার পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত হালকা, নিরাপদ, সহজে বহনযোগ্য রিভলবার, পিস্তল প্রভৃতি অগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজনীতা বিশেষভাবে অনুভব করেন। হাতিয়ার হিসাবে বোমার আরও অন্যান্য অসুবিধা ছিল। বোমা তৈরি ও প্রয়োগকালীন দুর্ঘটনা ছাড়াও তৈরির উপযোগী স্থান নির্বাচন, গোয়েন্দা পুলিসের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে পিক্রিক এসিড, পটাশ ক্লোরেট প্রভৃতি রাসায়নিক উপকরণ ও বিস্ফোরক পদার্থ সংগ্রহ, খোল তৈরির উপযোগী নানা ধরনের ধাতু, ছাঁচ, ঢালাইয়ের যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি জোগাড়, বিশ্বস্ত ও দক্ষ কারিগর সংগ্রহ, পরীক্ষা নিরীক্ষার উপযোগী গোপনীয় স্থানের সন্ধান সহজসাধ্য ছিল না। তখন দেশ স্বাধীন ছিল না; পরাধীন ছিল। এখন যেরূপ বিস্ফোরক দ্রব্য সহজলভ্য এবং চকোলেট বোমা থেকে পেট্রোল বোমা, মলোটভ ককটেল প্রভৃতি নানা ধরনের বোমা তৈরি সহজসাধ্য তখন তা ছিল শুধু দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্য; আর তখন বোমার ধরনও ছিল ভিন্ন প্রকারের। তখন পেট্রোল বোমার ন্যায় আগুনে বোমা তৈরি হোত না। মাষ্টারদা সূর্য সেন বোমার চেয়ে রিভলবারের কার্যকারিতায় বেশী বিশ্বাস করতেন; কারণ তাঁর ধারণা রিভলবার অপেক্ষা বোমা নিক্ষেপে বিপদের ঝুঁকি ছাড়াও লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় সম্ভাবনা

সমধিক; তাই তিনি বলতেন "বোমার চেয়ে রিভলবারের প্রতি বেশী আস্থা রাখ।" আসানুল্লা হত্যার প্রাক্কালে হরিপদ ভট্টাচার্যকে তিনি বোমার পরিবর্তে রিভলবার ব্যবহার করতে নির্দেশ দেন— অকেজো বোমার ন্যায় যান্ত্রিক গোলযোগের ফলে অকেজো রিভলবার অনেক সময় ব্যর্থতা ও বিপদের কারণ হয়েছে। প্রদ্যোত ভট্টাচার্যের ধরা পড়ার কারণ তাঁর অকেজো রিভলবার, এর পরিবর্তে তাঁর কাছে যদি একটা বোমা থাকত তা হলে হয়ত তিনি অনুসরণকারীদের ছত্রভঙ্গ করে অনায়াসে পলায়ন করতে পারতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অগ্নিযুগে বিপ্লবীরা দু-ধরনের রিভলবার ও পিস্তল ব্যবহার করতেন। এক. ছোট নল (Short Barrel), দুই. লম্বা নল (Long Barrel)। বোর অনুযায়ী নানা ধরনের রিভলবার ছিল। এ ছাড়া বিভিন্ন কোম্পানির পৃথক ধরনের পিস্তল ও রিভলবার ছিলঃ কোল্ট, ওয়েবলি প্রভৃতি রিভলবার; ব্রাউনিং, বেলজিয়ান্ আমেরিকান প্রভৃতি অটোমেটিক পিস্তল। এ ছাড়া ছিল মাউজার পিস্তল। এই পিস্তল ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের।

পিস্তল ও রিভলবার সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী শ্রীগণেশ ঘোষের মন্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

অগ্নিযুগের পিস্তল ও রিভলবার

"ভারতের অগ্নিযুগে বিপ্লবী কর্মীরা যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতেন তার মধ্যে বোমা ব্যতীত অপর আগ্নেয়াস্ত্র ছিল "ছোট বন্দুক" অর্থাৎ "হাতবন্দুক" যে গুলোকে ইংরেজীতে সাধারণতঃ "পিস্তল" বলা

হয়। এই হাতবন্দুকগুলো যথার্থই এত ছোট যে এগুলোকে এক হাতেই ব্যবহার করা যায়।"

এই "পিস্তলগুলো" দুই ধরনের হয়। এক. "রিভলবার" এবং দুই. "অটোমেটিক" যাকে আমরা "পিস্তল" বলি। রিভলবারগুলোতে গুলি ছুড়বার জায়গায় থাকে একটি ছোট চক্র, যার ভিতরে কয়েকটি গুলি একটি একটি ক'রে সতর্কভাবে ঢুকিয়ে রাখতে হয়। রিভলবারের নীচে একটি ছোট হুক্ ("ট্রিগার") থাকে। ডান হাতে রিভলবারের হাতলটি ("হ্যাণ্ডেল") শক্ত করে ধরে, এবং উপরে তুলে চোখের সোজাসুজি রিভলবারের নলটি লক্ষ্য বস্তুর প্রতি তাক্ করে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে নীচের হুক্ অর্থাৎ "ট্রিগারটি" টেনে দিলেই ওই গোল চক্রটি একটু ঘুরে একটি গুলি এনে ঠিক নালির মুখে বসিয়ে দেয় এবং নীচের তর্জনীর টানে "ট্রিগারের" উপরের খুব ছোট একটি হাতুড়ির মত যন্ত্র গিয়ে গুলিটির পেছনে গিয়ে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গেই গুলিটি নল দিয়ে বের হয়ে লক্ষ্য বস্তুর প্রতি ধাবমান হয়। এমনি করে "ট্রিগারের" টানে টানে একটির পর একটি গুলি বের হয়ে চক্রের গুলি সমূহ ব্যবহৃত হয়ে যায়। (সাধারণতঃ বিভিন্ন ধরনের রিভলবারের চক্রে ৫টি কিংবা ৬টি অথবা ৭টির বেশী গুলি থাকে না), কিন্তু গুলির শূন্য খোল সমূহ ঐ চক্রের মধ্যেই থেকে যায়। তখন কাঠির মত রিভলবার সংলগ্ন একটি যন্ত্র দিয়ে ঠেলে ঠেলে চক্রটির প্রত্যেক কক্ষ থেকে শূন্য খোলগুলি বাইরে ফেলে দিতে হয়। অবশ্য আজকাল অর্থাৎ আধুনিক যুগে অর্থাৎ প্রায় ১০০ বছর পূর্বে আবিষ্কারের ফলে প্রায় সব রিভলবারেই ব্যবস্থা আছে রিভলবার সংলগ্ন একটি ছোট যন্ত্রে বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে একটু চাপ দিলেই রিভলবারটি মাঝামাঝি একেবারে দু-ভাগ হয়ে যায় এবং সঙ্গেই আর একটি যন্ত্রের চাপে শূন্য খোলগুলি সব একসঙ্গে বাইরে পড়ে যায়।

অটোমেটিক সমূহে (পিস্তল সমূহে) গুলি ভর্তি করার এবং

গুলিসমূহের শূন্য খোলগুলি বাইরে ফেলে দেবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের। অটোমেটিক সমূহে চক্রের মত কিছুই নেই। অটোমেটিক সমূহে এক একটি করে গুলি ভরতে হয় না, একেবারে দশটি গুলি একসঙ্গে এবং এক বারে ভর্তি করে রাখবার ব্যবস্থা আছে। গুলি রাখবার ব্যবস্থা অটোমেটিক সমূহের ধরবার হ্যাণ্ডেলের ভিতরেই আছে। কেবল মাত্র বোধ হয় "মাউজার অটোমেটিক" ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সব আয়তনের অটোমেটিক সমূহের ধরবার হ্যাণ্ডেলটি একটি ছোট ফাঁপা একটু লম্বা বাক্‌সের মত। এই বাক্‌সের ধরনের হ্যাণ্ডেলের মধ্যেই সাধারণতঃ ১০টি গুলি চেপে ভর্তি করে রাখতে হয়। এই গুলিসমূহের নীচে থাকে একটি স্প্রিং। এই গুলিসমূহ চেপে ভর্তি করে রাখার পর অটোমেটিকের নলের উপরের ঢাকনার মত যন্ত্রটি একটু পেছনের দিকে টেনে ছেড়ে দিলেই এই ঢাক্‌না যন্ত্রটি স্প্রিং এর টানে আবার সামনে চলে যায় এবং সেই সময় নীচের স্প্রিং-এর চাপে সবার উপরের গুলিটি নলের ভিতর চলে যায়। তখন ডান হাতের তর্জনী দিয়ে নীচের ট্রিগারে টান দিলেই ভিতরের একটি ছোট যন্ত্র আপনা থেকেই নলের ভিতরের গুলিটির পেছনে গিয়ে আঘাত করে এবং গুলিটি লক্ষ্য বস্তুর প্রতি ধাবমান হয়ে চলে যায়। গুলিটি বের হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই অটোমেটিকটির নলের উপর ঢাকনার মত যন্ত্রটি বারুদের গ্যাসের চাপে আপনা থেকেই পেছনের দিকে চলে আসে এবং তখন শূন্য খোলটি ঐ ঢাকনার একটি ছোট ছিদ্র দিয়ে বাইরে পড়ে যায়। স্প্রিং-এর টানে ঐ ঢাকনাটি আবার সামনের দিকে নিজের যায়গায় চলে যায় এবং সেই সময়ে হ্যাণ্ডেলের নীচে স্প্রিং-এর চাপে উপরের আর একটি গুলি নলের মুখে চলে যায়। তারপর আবার ট্রিগার টিপলেই আর একটি গুলি বের হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে শূন্য খোলটি বাইরে পড়ে যায়। এমনি করেই ১০টি গুলি আপনা আপনিই (automatically) শেষ হয়ে যায়, তার জন্য আর

কিছুই করতে হয় না। এই জন্যই এই ছোট আগ্নেয়াস্ত্রগুলিকে বলে "অটোমেটিক" এবং অন্য ধরনের-গুলিতে একটি চক্র থাকে যেটি ঘুরে ঘুঁরে গুলি সরবরাহ করে সেই-গুলিকে বলে "রিভলবার"।

"মাউজার অটোমেটিক-গুলি জার্মান দেশে প্রস্তুত অস্ত্র। এ গুলি সাধারণতঃ বেশ একটু বড় আকারের এবং লম্বা হয়। এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি সাধারণতঃ একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখা হয় এবং প্রয়োজন হলে, বিশেষভাবে বেশ দূরের লক্ষ্য বস্তুর প্রতি গুলি ছুড়তে হলে ওই কাঠের বাক্সটির সম্মুখের দিকে "মাউজার পিস্তলের" হ্যাণ্ডেলটি খুব সহজে কিন্তু খুব ভাল করে আটকে রাখার ব্যবস্থা আছে। ওই কাঠের বাক্সটি একটি রাইফেলের আকারে তৈরি। বাক্সটির সম্মুখভাগে "মাউজার পিস্তলটি" আটকে রেখে বাক্সটি রাইফেলের মত ডান কাঁধে তুলে রাইফেলের মতই ব্যবহার করা চলে।

এই সব "হাতবন্দুক" সমূহ অর্থাৎ রিভলবার কিংবা "অটোমেটিক" সমূহ নানা সাইজের হয়। যেগুলি খুব ছোট সেগুলির নলের ছিদ্রের ব্যাস সাধারণতঃ হয় '২২০ ইঞ্চি অর্থাৎ এক ইঞ্চির পাঁচ ভাগের এক ভাগের মত। এইসব যন্ত্রের গুলি সমূহ খুবই ক্ষুদ্র এবং সেই জন্যই সেগুলির ক্ষতি করার অর্থাৎ আহত করার ক্ষমতাও খুব কম। সাধারণতঃ নারীরা আত্মরক্ষার জন্য এইগুলি সঙ্গে রাখেন। এর চাইতে ক্ষুদ্র ব্যাসের কোনরূপ রিভলবার অথবা অটোমেটিক আছে কিনা আমার জানা নাই।

এর চাইতে বড়গুলির ব্যাস '৩২০ ইঞ্চি এবং তারও বড়গুলির ব্যাস হয় '৪৪০ ইঞ্চি এবং তার চাইতেও বড়গুলির ব্যাস '৪৫৫ ইঞ্চি। এর চাইতে বড় ব্যাসের রিভলবার কিংবা অটোমেটিক আছে কিনা আমার জানা নাই।"

রিভলবার ও পিস্তল সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা।

১৮৯৭—২২শে জুন : দামোদর হরি চাপেকারের গুলিতে পুনার

প্লেগ কমিশনার র‍্যাণ্ড এবং মহাদেও বিনায়ক রানাডের গুলিতে লেঃ আয়ার্ষ্ট নিহত হয়।

১৮৯৯—৮ই ফেব্রুয়ারী : চাপরাশির ছদ্মবেশে বাসুদেব হরি চাপেকর ও মহাদেও বিনায়ক রানাডে যথাক্রমে রিভলবার ও পিস্তলের গুলিতে বিশ্বাসঘাতক গনেশ দ্রাবিড় ও রামচন্দ্র দ্রাবিড়কে হত্যা করেন।

১৯০৭—২৩শে ডিসেম্বর : গোয়ালন্দ স্টেশনে পুলিন বিহারী দাস প্রেরিত ঢাকা অনুশীলন সমিতির কর্মী শচীন ব্যানার্জি ও সত্যেন বসুর সহায়তায় শিশির গুহ রায়ের রিভলবারের গুলিতে ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এলেন আহত হন। প্রকাশ ঐ আঘাতে পরবর্তীকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯০৮। ১লা মে—মজঃফরপুর হত্যাকাণ্ডের পরদিন ক্ষুদিরাম ওয়াইনি স্টেশনে একটি গুলিভরা ছোট রিভলবার ও আরেকটি গুলি হীন বড় রিভলবারসহ ধরা পড়েন। অতর্কিতে ধরা পড়ায় তিনি রিভলবার ব্যবহারের সুযোগ পান নি।

২রা মে—গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য প্রফুল্ল চাকী স্বীয় ব্রাউনিং পিস্তলের গুলিতে মোকামা স্টেশনে আত্মহত্যা করেন।

২রা জুন—বাহ্রা ডাকাতিতে শুধু বন্দুক পিস্তল নয়; দূরপাল্লার উইনচেষ্টার রাইফেল পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়।

৩১শে আগষ্ট—কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু জেলের মধ্যে রিভলবারের গুলিতে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেন। কানাইলালেরটি ছিল শর্ট ব্যারেলের ছোট; আর সত্যেন্দ্রনাথেরটি ছিল লং ব্যারেলের বড় রিভলবার।

৬ই নভেম্বর—জিতেন রায় কলকাতা ওভারটুন হলে ছোটলাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারের (Andrew Fraser) প্রতি রিভলবারের গুলি বর্ষণ করেন।

৯ই নভেম্বর—কলকাতা সারপেনটাইন লেনে রণেন গাঙ্গুলি ও

শ্রীশ পাল রিভলবারের গুলিতে পুলিস কর্মচারী নন্দলাল ব্যানার্জিকে হত্যা করেন।

১৯০৯। ১০ই ফেব্রুয়ারী—আলিপুর পুলিস কোর্টের প্রাঙ্গণে চারুচন্দ্র বসু প্রকাশ্য দিবালোকে রিভলবারের গুলিতে পাবলিক প্রসিকিউটর আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা করেন।

১লা জুলাই—লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে জাহাঙ্গীর হলে আয়োজিত এক সভায় মদনলাল ধিংড়া বিনায়ক দামোদর সাভারকর প্রদত্ত কোল্ট রিভলবারের গুলিতে ভারত সচিবের পার্শ্বচর (A. D. C) কার্জন ওয়াইলিকে হত্যা করেন। ধিংড়ার কাছে ছোট্ট একটি বেলজিয়ান্ অটোমেটিক পিস্তলও ছিল; কিন্তু তিনি সেটি ব্যবহার করেন নি।

২১শে ডিসেম্বর—অনন্ত লক্ষ্মণ কানহেরে কৃষ্ণগোপাল কার্ভে ও বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডের সহায়তায় নাসিকের বিজয়ানন্দ থিয়েটার হলে সম্বর্ধনা সভায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাকসনকে বিনায়ক দামোদর সাভারকর প্রেরিত ব্রাউনিং পিস্তলের গুলিতে হত্যা করেন।

১৯১০। ২৪শে জানুয়ারী—বীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রকাশ্য দিবালোকে হাইকোর্টের সিঁড়িতে ওয়েবলি রিভলবারের গুলিতে গোয়েন্দা পুলিসের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সামশুল আলমকে হত্যা করেন।

১৯১১। ১৭ই জুন—মানিয়াচি জংসন স্টেশনে ওয়াঞ্চি আয়ার ট্রেনে ভ্রমণরত তিরুনেলভেলির জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ অ্যাশকে তাঁর কামরায় ব্রাউনিং পিস্তলের গুলিতে হত্যা করেন; পরে গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য স্টেশন প্ল্যাটফর্মের শৌচাগারে প্রবেশ করে স্বীয় পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেন।

১১ই ডিসেম্বর—বঙ্গভঙ্গ রদের রাজকীয় ঘোষণার দিন বরিশাল শহরে মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর রিভলবারের গুলিতে পুলিস ইন্সপেক্টর মনোমোহন ঘোষ নিহত হয়।

১৯১২। ২৪শে সেপ্টেম্বর—ঢাকা গোয়াল নগরে মহারাজ

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ও প্রতুল গাঙ্গুলির রিভলবারের গুলিতে কুখ্যাত হেড কনেষ্টবল রতিলাল রায় নিহত হয়।

১৯১৩। ২৯শে আগষ্ট—কলেজ স্কোয়ারে প্রতুল গাঙ্গুলির রিভলবারের গুলিতে গোয়েন্দা বিভাগের হেড্ কনেষ্টবল হরিপদ দেব নিহত হয়।

১৯১৪। ১৯শে জানুয়ারী—চিৎপুর রোডে অনুশীলন সমিতির খগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর রিভলবারের গুলিতে গোয়েন্দা পুলিসের ইন্সপেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ নিহত হয়। এ ব্যাপারে অনুশীলন সমিতির নির্মলকান্ত রায় ও প্রিয়নাথ ব্যানার্জি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নির্মলকান্তের সাথে একটি পাঁচঘরা রিভলবার ছিল।

১৯শে জুন—চট্টগ্রাম শহরে প্রতুল গাঙ্গুলি ও নলিনীকান্ত ঘোষের গুলিতে পুলিসের সংবাদদাতা সত্যেন্দ্রনাথ সেন নিহত হয়।

১৯শে জুলাই—ঢাকা শহরে অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ রিভলবারের গুলিতে পুলিসের চর রামদাস ওরফে উমেশ দে কে হত্যা করেন। জানা যায় বিপ্লবীদের সাথে বোমাও ছিল।

২৬শে আগষ্ট—কাষ্টমস্ অফিস থেকে খালাস হয়ে কোম্পানির গুদামজাত হওয়ার পথে বিপ্লবীরা কৌশলক্রমে কলকতার প্রসিদ্ধ অস্ত্রব্যবসায়ী রডা কোম্পানির ২০২টি বাক্সের মধ্যে দশটি বাক্সে ভরা ৪৬ হাজার গুলিসহ জার্মানীতে তৈরি পঞ্চাশটি মাউজার পিস্তল সরিয়ে ফেলেন। এ বিষয়ে তাঁদের সাহায্য করেন রডা কোম্পানির কর্মচারী শ্রীশ মৈত্র ওরফে হাবুল মৈত্র। এই পিস্তলগুলো বিভিন্ন বৈপ্লবিক দলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। তখন সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা ছিল দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে; আর এর মূলে ছিল দেশাত্মবোধ।

এই পরিকল্পনা রচনার কৃতিত্ব শ্রদ্ধেয় বিপিন গাঙ্গুলি পরিচালিত আত্মোন্নতি দলের; কিন্তু এ রূপায়ণে অন্যান্য দলের কর্মীদের সক্রিয় সহায়তা ছিল বলে জানা যায়।

সিডিসন কমিটির রিপোর্ট অনুসারে: "This arms theft was an event of great importance in the development of revolutionary crime in India". এই পিস্তল-গুলোর কার্যকারিতা সম্পর্কে উক্ত কমিটির মত: "The pistols were of large size ·300 bore. The pistols were so constructed and packed that by attaching to the butt, the box containing the pistols a weapon was produced, which could be fired from the shoulder in the same way as rifle."

পুলিসের সাথে সঙ্ঘর্ষকালে এই পিস্তলগুলো খুব কার্যকরী হয় এবং বিভিন্ন দলের বিভিন্ন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে এ ধরনের পিস্তল ব্যবহৃত হয়। পুলিস বিপ্লবীদের হস্তগত রডা কোম্পানির এই পিস্তলগুলোর তিরিশটি এবং ২৭ হাজার গুলি উদ্ধার করতে সমর্থ হয়; বাকীগুলো উদ্ধার করতে পারে নি। নিক্সন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ৪৪টি ক্ষেত্রে এই পিস্তল ব্যবহৃত হয়, এবং এই পিস্তলের গুলিতে ২১ জন নিহত এবং ৪৪ জন আহত হয়। (৫৮)

২৯শে সেপ্টেম্বর—বাবা গুরুদিৎ সিং-এর নেতৃত্বে কোমাগাটা মারু জাহাজের যাত্রী গদর দলের বিপ্লবীরা আমেরিকান পিস্তল ও রিভলবার দিয়ে বজবজে পুলিসের রাইফেলের সাথে লড়াই করেন।

১৯১৫। ২১শে ফেব্রুয়ারী—ডাণ্ডি খাঁর নেতৃত্বে সিঙ্গাপুর অভ্যুত্থানে ভারতীয় সিপাহীরা সামরিক রাইফেল, পিস্তল, রিভলবার, মেসিনগান, কামান প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেন।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—৭৩নং পাথুরিয়াঘাটা লেনের দ্বিতলের গোপন আশ্রয় কেন্দ্রে যতীন মুখার্জির নির্দেশে রাধাচরণ প্রামাণিকের রিভল-বারের গুলিতে আহত নীরদ হালদারের হাসপাতালে মৃত্যু হয়।

২৮শে ফেব্রুয়ারী—কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী ও

তাঁর সঙ্গীদের রিভলবারের গুলিতে কলকাতা গোয়েন্দা পুলিসের ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখার্জি নিহত হয়।

১৪ই আগষ্ট—ব্রহ্মদেশের মেমিয়োতে সোহনলাল পাঠক তিনটি অটোমেটিক পিস্তল ও ২৭০ রাউণ্ড গুলি সহ ধরা পড়েন।

২৫শে আগষ্ট—বিপিন গাঙ্গুলির গ্রেপ্তারের সহায়তাকারী মুরারী মিত্রকে আগরপাড়ায় তার বাসভবনে মাউজার পিস্তলের গুলিতে হত্যা করা হয়।

৯ই সেপ্টেম্বর—চাষখণ্ডে যতীনমুখার্জি ও তাঁর সঙ্গীরা মাউজার পিস্তল নিয়ে পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেন।

১৮ই নভেম্বর—ঢাকা শহরে অনুকূল চক্রবর্তী সহ অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় কয়েকজন বিপ্লবীর গৃহে খানাতল্লাসী করে পুলিস মাউজার পিস্তল সহ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র হস্তগত করে।

১৯১৬। ১৬ই ফেব্রুয়ারী—অজ্ঞাত আততায়ীর পিস্তলের গুলিতে পুলিস ইন্সপেক্টর মধুসূদন ভট্টাচার্য নিহত হয়।

৩০শে জুন—ভবানীপুরে অনুশীলন সমিতির অতীন্দ্রমোহন রায় ও সুরেশ চক্রবর্তীর মাউজার পিস্তলের গুলিতে গোয়েন্দা বিভাগের কুখ্যাত ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বসন্তকুমার চ্যাটার্জি নিহত হয়।

১৯১৭। ৮ই জানুয়ারী—শেষ রাত্রে গৌহাটিতে অনুশীলন সমিতির আটগাঁও আশ্রয়কেন্দ্রে এবং পরদিন নবগ্রহ পাহাড়ের নিকট বিপ্লবীরা মাউজার পিস্তল ও রিভলবার নিয়ে পুলিসের সাথে যুদ্ধ করেন। এই খণ্ডযুদ্ধে নেতৃত্বে দেন ডালণ্ডাহাউস পলাতক দুর্ধর্ষ বিপ্লবী নলিনীকান্ত ঘোষ।

১৯১৮। ১৫ই জুন—পুলিস অতর্কিতে ভোর রাত্রে ঢাকা কলতা-বাজারের আশ্রয়কেন্দ্র আক্রমণ করলে অনুশীলন সমিতির দুই পলাতক বিপ্লবী তারিণী মজুমদার (ষ্টার) ও নলিনী বাগচি স্কলার মাউজার পিস্তল ও রিভলবার নিয়ে যুদ্ধ করার পর সম্মুখ সংগ্রামে মৃত্যু বরণ

করেন। তারিণীর মৃত্যু হয় যুদ্ধ ক্ষেত্রে; আহত নলিনীর মৃত্যু হয় হাসপাতালে।

১৯২৪। ১২ই জানুয়ারী—গোপীনাথ (গোপীমোহন) সাহা স্যার চার্লস্ টেগার্ট ভ্রমে আর্ণেষ্ট ডে নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গকে রিভলবারের গুলিতে হত্যা করেন।

১৯২৮। ১৭ই ডিসেম্বর—পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ কল্পে হিন্দুস্থান সোসালিষ্ট রিপাবলিকান আর্মির (H.S.R.A.) শিবরাম রাজগুরু ও ভগৎ সিং-এর রিভলবারের গুলিতে কুখ্যাত স্যাণ্ডার্স নিহত হয় এবং ভগৎ সিং-এর গুলিতে সার্জেন্ট চেরেনি আহত ও চন্দ্রশেখর আজাদের মাউজার পিস্তলের গুলিতে বিপ্লবীদের অনুসরণরত হেড্ কনেষ্টবল চন্দন সিং নিহত হয়।

১৯৩০। ১৮ই এপ্রিল—চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান কালে পুলিস অস্ত্রাগার ও রেলওয়ে অস্ত্রগার আক্রমণে রিভলবার, অটোমেটিক পিস্তল এবং ১২ বোরের সাধারণ একনলা ও দোনলা বন্দুক প্রভৃতি অতি সাধারণ ও স্বল্প অস্ত্র নিয়েই বিপ্লবীরা সফলতা লাভ করেন। উভয় অস্ত্রাগার থেকে প্রচুর পুলিসী মাস্কেট ও'৪৫৫ বোরের ওয়েবলি রিভলবার বিপ্লবীদের হস্তগত হয়। সামরিক বিভাগে ব্যবহৃত ওয়েবলি রিভলবার আয়তনে বেশ বড় ও ভারী, ছুড়তেও বেশ শক্তির প্রয়োজন; মারণক্ষমতাও বেশী, পাল্লাও অপেক্ষাকৃত দূরগামী। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা জালালাবাদের যুদ্ধে পুলিসী মাস্কেট এবং অধিকাংশ বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে ওয়েবলি রিভলবার ব্যবহার করেছেন।

২২শে এপ্রিল—জালালাবাদের যুদ্ধে বিপ্লবীরা পুলিস মাস্কেট ও ওয়েবলি রিভলবার সম্বল করে পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর মিলিত আক্রমণে রাইফেল, লুইসগান ও মেসিনগানের মোকাবিলা করে জয়ী হন। প্রচুর হতাহত সৈন্যকে ফেলে রেখে সরকারী সৈন্য বাহিনী রাত্রের অন্ধকারে শহরের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যায়।

ঐদিন (২২শে এপ্রিল) ফেনী স্টেশনে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত পিস্তল ও রিভলবারের গুলিবর্ষণে পুলিস বেষ্টনী ভেদ করেন।

২৪শে এপ্রিল—চট্টগ্রামে পুলিস বেষ্টনী ভেদে অসমর্থ অমরেন্দ্র-নাথ নন্দী আত্মসমর্পণের পরিবর্তে স্বীয় ওয়েবলি রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন।

৬ইমে—সন্দেহক্রমে ছ-জন বিপ্লবীর অনুসরণরত পুলিশবাহিনী গ্রামবাসীর সহায়তায় কালার পোলের কাছে ছ-জনের অন্যতম সুবোধ চৌধুরীকে গুলিভরা ওয়েবলি রিভলবার সহ গ্রেপ্তার করলে তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে ব্যর্থকাম হন। স্বল্পকাল পরে ওয়েবলি রিভলবার সহ ফণীন্দ্রনাথ নন্দী ধরা পড়েন।

৭ইমে—চারটি ওয়েবলি রিভলবার মাত্র সম্বল করে বিরাট পুলিসবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে মনোরঞ্জন সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, স্বদেশ রায় ও রজত সেন জুলদা রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করেন।

২৯শে আগষ্ট—প্রকাশ্য দিবালোকে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রাঙ্গণে বি. ভি. দলের বিনয় বসুর রিভলবারের গুলিতে পুলিস ইন্স-পেক্টর জেনারেল লোম্যান ও ঢাকার কুখ্যাত পুলিস সাহেব হাড্‌সন গুরুতররূপে আহত হয়। পরে লোম্যানের মৃত্যু ঘটে; হাড্‌সন চিরজীবনের জন্য অকর্মণ্য হয়ে যায়।

১লা সেপ্টেম্বর—মধ্যরাত্রে চন্দননগরের গোঁদলপাড়ার আশ্রয় গৃহে অতর্কিতে হানা দেওয়ায় বিপ্লবীদের সাথে পুলিশের যে খণ্ড যুদ্ধ হয় তাতে নিহত হন জীবন ঘোষাল আর ধরা পড়েন গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্ত। তাঁদের কাছে পাওয়া যায় যথাক্রমে একটি ·৪৫৫ বোরের ওয়েবলি রিভলবার, একটি ·৪৫০ বোরের কোল্ট রিভলবার ও একটি ·৩২ বোরের অটোমেটিক পিস্তল।

৪ঠা অক্টোবর—লাহোরে গোয়েন্দা পুলিসের স্পেশাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট খান বাহাদুর আব্দুল আজিজের গাড়িতে বিপ্লবীরা

গুলি বর্ষণ করলে দেহরক্ষীদের সাথে গুলি বিনিময় হয়। এর ফলে অনেক দেহরক্ষী নিহত এবং ড্রাইভার ও অন্য একজন দেহরক্ষী গুরুতর আহত হয়।

১লা ডিসেম্বর—চাঁদপুর রেল স্টেশনে ভোররাত্রে পুলিস ইন্সপেক্টর জেনারেল ক্রেগ ভ্রমে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তী ওয়েবলি রিভলবারের গুলিতে রেলওয়ে পুলিস ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জিকে হত্যা করেন।

৮ই ডিসেম্বর –বি. ভি. দলের মেজর বিনয় বসুর নেতৃত্বে ক্যাপটেন দীনেশ গুপ্ত ও লেফটেনাণ্ট বাদল গুপ্ত (সুধীর গুপ্ত) বি. ভির. অ্যাকসন স্কোয়াডের সরকারী দপ্তরখানা আক্রমণের পরিকল্পনাকে সাফল্যের সহিত বাস্তবে রূপায়িত করেন। বেলা প্রায় ১২টার সময় ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত তিনজন বিপ্লবী রাইটার্স বিল্ডিংএ প্রবেশ করে প্রথমেই রিভলবারের গুলিতে কারাসমূহের ইন্সপেক্টর জেনারেল লেঃ কর্নেল সিমসনকে হত্যা করেন। তাঁদের গুলিতে আহত হন জুডিসিয়াল সেক্রেটারী নেলসন ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারী। তারপর বিরাট পুলিস বাহিনীর সাথে যুদ্ধ সুরু হয় এই তিন বিপ্লবী বীরের। রিভলবারমাত্র সম্বল করে তাঁরা মোকাবিলা করেন অসংখ্য শক্তিশালী রাইফেলের। ইহাই বিখ্যাত "অলিন্দ যুদ্ধ"। গুলি নিঃশেষিত হলে বাদল পটাসিয়াম সাইনাইড সেবনে আত্মহত্যা করেন। গুলি করে আত্মহত্যার চেষ্টায় বিনয় ও দীনেশ গুরুতর আহত হন। পরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিনয়ের মৃত্যু হয়। চিকিৎসা দ্বারা দীনেশকে সুস্থ করে তুলে বিচারের প্রহসনে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়।

২৩শে ডিসেম্বর—লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিয়ে ফিরবার পথে পাঞ্জাবের গভর্নর স্যার জিওফ্রে মণ্টমরেন্সী হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান আর্মির হরিকিষেণ ও তাঁর সঙ্গীদের পিস্তলের গুলিতে আহত হন; পুলিস সাব-ইন্সপেক্টর চন্দন

সিং নিহত এবং জনৈক পুলিস ইন্সপেক্টর ও লেডি ডাক্তার আহত হয়। বিচারে হরিকিষেণ, রণবীর সিং, দুর্গাদাস এবং চমনলালের প্রাণ দণ্ডাদেশ হয়।

১৯৩১। ২৭শে ফেব্রুয়ারী: চন্দ্রশেখর আজাদের উপস্থিতির সংবাদ পাওয়া মাত্র এলাহাবাদের এস. পি. মিঃ নট বাওয়ার এবং ডি. সি. পি. ঠাকুর বিশ্বেশ্বর সিংএর নেতৃত্বে পুলিস বাহিনী এলাহাবাদের অ্যালফ্রেড্ পার্ক ঘিরে ফেলে। আজাদ মাউজার পিস্তল নিয়ে একাকী পুলিস বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে বীরের মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর গুলিতে নট এবং বিশ্বেশ্বর সিং আহত হয়।

৭ই এপ্রিল—বি. ভির. বিমল দাশগুপ্ত ও জ্যোতির্জীবন ঘোষের রিভলবারের গুলিতে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডি নিহত হন।

২২শে জুলাই—ফার্গুসন কলেজ পরিদর্শন কালে বোম্বের অস্থায়ী গভর্নর স্যার আর্নেষ্ট হটসন গোগেটের রিভলবারের গুলিতে আহত হন।

২৭শে জুলাই—যুগান্তর দলের মজিলপুর গ্রুপের কানাইলাল ভট্টাচার্য রিভলবারের গুলিতে প্রকাশ্য দিবালোকে আদালত গৃহে দীনেশ গুপ্তের প্রাণদণ্ড প্রদানকারী স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বিচারক এবং আলিপুরের জেলা ও দায়রা জজ গার্লিককে হত্যা করে পলায়নে অসমর্থ হওয়ায় পটাসিয়াম সাইনাইড্ সেবনে আত্মহত্যা করেন।

৩০শে আগষ্ট—হরিপদ ভট্টাচার্য রিভলবারের গুলিতে চট্টগ্রামের কুখ্যাত ডি. এস. পি. আসানুল্লা খানকে হত্যা করেন।

২৮শে অক্টোবর—ঢাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে চট্টগ্রামের পলাতক বিপ্লবী সরোজ কান্তি গুহের ওয়েবলি রিভলবারের গুলিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্নো আহত হন।

২৯শে অক্টোবর—কলকাতার ক্লাইভ বিল্ডিংএ ইউরোপীয়

অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়ার্সের প্রতি গুলিবর্ষণ প্রচেষ্টায় বি. ভি.র বিমল দাশগুপ্ত ঘটনা স্থলেই ধরা পড়েন।

১৪ই ডিসেম্বর—কুমিল্লায় প্রখ্যাত বিপ্লবী ললিত বর্মণের গ্রুপের শান্তি ঘোষ (দাস) ও স্থনীতি চৌধুরী (ঘোষ) রিভলবারের গুলিতে ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ষ্টিভেন্সকে হত্যা করেন।

১৯৩২। ২৩শে (মতান্তরে ২২শে) জানুয়ারী—এলাহাবাদে মিস্ এলিস্ (সাবিত্রী দেবী) নাম্নী জনৈক আইরিশ মহিলার গৃহে পুলিসের সাথে গুলি বিনিময়ের পর হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান আর্মির যশপাল দু-টি পিস্তল সহ ধরা পড়েন।

৬ই ফেব্রুয়ারী—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে সিনেট হাউসে যুগান্তর দলের বীনা দাস (ভৌমিক) বাঙ্গলার গভর্নর স্যার ষ্ট্যানলি জ্যাকসনের প্রতি রিভলবারের গুলি বর্ষণকালে ধরা পড়েন।

৩০শে এপ্রিল—বি. ভি. দলের প্রভাংশু পালের রিভলবারের গুলিতে মেদিনীপুর জেলা বোর্ড অফিসে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস নিহত হন। তাঁকে সাহায্য করেন বি. ভি.-র প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য।

১৩ই জুন—চট্টগ্রামে ধলঘাট সঙ্ঘর্ষে নির্মল সেনের ওয়েবলি রিভলবারের গুলিতে ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ নিহত হন। এই যুদ্ধে নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন শহীদ হন।

২৭শে জুন—ঢাকায় বঙ্কিম স্ট্রীটে শেষ রাত্রে মুন্সীগঞ্জের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কামাক্ষা সেন পিস্তলের গুলিতে নিহত হন। এই হত্যার জন্য সমিতির কর্মী কালীপদ মুখার্জির স্বীকারোক্তির ফলে প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু পরে জানা যায় অনুশীলন সমিতির দুর্গেশ ভট্টাচার্যের নির্দেশে ভূপেশ ব্যানার্জি ঘুমন্ত কামাক্ষা সেনকে গুলি করেন। প্রহরীদের রিভলবার দেখিয়ে নিরস্ত করেন দুর্গেশ ভট্টাচার্য ও অনন্ত চক্রবর্তী।

১৯শে (মতান্তরে ২৯শে) জুলাই—সূর্যসেনের নির্দেশে

শৈলেশ্বর রায়ের ওয়েবলি রিভলবারের গুলিতে কুমিল্লা শহরে এস্. পি. এলিসন নিহত হয়।

২২শে আগষ্ট—ঢাকা নবাবপুর রেলওয়ে ক্রশিং-এর নিকট বি. ভি. দলের বিনয় রায় ঢাকার অতিরিক্ত এস. পি. গ্রানবিকে রিভলবার দিয়ে গুলি করেন।

১৮ই নভেম্বর—রিভলবারের গুলিতে রাজসাহীর জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লিউক আহত হয়।

১৯৩৩। ১৬ই ফেব্রুয়ারী—চট্টগ্রামে গৈরলা সজ্ঘর্ষে ব্রজেন সেন সহ সূর্যসেন ধরা পড়েন। উভয়পক্ষে গুলি বিনিময় হয়। অন্যেরা পুলিসবাহিনী অতিক্রম করেন।

১৮ই মে—চট্টগ্রামের গহিরা সজ্ঘর্ষে বিপ্লবীরা রিভলবার দিয়ে পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর রাইফেলের মহড়া নেন। এই সজ্ঘর্ষে পুলিসের গুলিতে নিহত হন গৃহ স্বামী পূর্ণ তালুকদার ও বিপ্লবী মনোরঞ্জন দাস; গুরুতর আহত হন নিশি তালুকদার; ধরা পড়েন তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত (যোশী) এবং সুধীন্দ্র দাস।

২২মে—কলকাতায় ১৩৬।৩ বি কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটের সজ্ঘর্ষে বিপ্লবীদের রিভলবারের গুলিতে আহত হয় স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিস ইন্সপেক্টর এম. ভট্টাচার্য; ধরা পড়েন যুগান্তর দলের দীনেশ মজুমদার, নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জি।

৩রা সেপ্টেম্বর—মেদিনীপুরের পুলিস গ্রাউণ্ডে বি. ভি. দলের অনাথ পাঞ্জা ও মৃগাঙ্ক দত্তের রিভলবারের গুলিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বার্জের মৃত্যু হয়। শাস্ত্রীর গুলিতে অনাথ পাঞ্জা ঘটনা স্থলেই শহীদ হন; আহত মৃগাঙ্ক দত্তের হাসপাতালে মৃত্যু হয়।

১৯৩৩-৩৫—আন্ত প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা—অনুশীলন সমিতির প্রভাত চক্রবর্তীর শীতলাতলা লেনের গৃহে খানাতল্লাসী করে পুলিস ৪৫০ বোরের একটি রিভলবার পায়। পুলিস অনুশীলন সমিতির বহু সদস্যের গৃহ খানাতল্লাসী করে ভারত ও ব্রহ্মদেশ ব্যাপী

এক ষড়যন্ত্রের সন্ধান পায়। এর ফলে সুরু হয় বিখ্যাত আন্তঃ প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯৩৪। ২০শে জানুয়ারী—টিটাগড়ে একটি গৃহে খানাতল্লাসীর ফলে পুলিস কিছু আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য ও আপত্তিকর কাগজপত্র হস্তগত করে এবং অনুশীলন সমিতির পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত, শ্যামবিনোদ পাল চৌধুরী ও শ্রীমতী পারুল মুখার্জিকে গ্রেপ্তার করে "টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার" সূত্রপাত করে।

৮ই মে—দার্জিলিং রেসকোর্সে বি. ভি. দলের ভবানী ভট্টাচার্য বাঙ্গলার গভর্নর স্যার এণ্ডারসনকে গুলি করেন। কিন্তু তাঁর রিভলবারের গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলে বি. ভি. দলের অপর কর্মী রবীন্দ্র ব্যানার্জি গভর্নরকে লক্ষ্য করে পিস্তলের গুলি ছোড়েন; কিন্তু এবারও গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়।

১০ই এপ্রিল—নারায়ণগঞ্জের বাবুরাইল রোডে বি. ভি. দলের বিপ্লবীদের অনুসরণ রত হোমগার্ড রমজান মিঞা রিভলবারের গুলিতে নিহত ও অপর একজন গুরুতর আহত হয়। এ বিষয়ে ধরা পড়েন মতিলাল মল্লিক।

১৯৪০। ১৩ই মার্চ—রয়েল সেন্ট্রাল এশিয়ান সোসাইটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে লণ্ডনের ক্যাক্সটন হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় উধম সিং-এর রিভলবারের গুলিতে পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব গভর্নর কুখ্যাত স্যার মাইকেল ওডায়ার নিহত হন এবং ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড আহত হন। গুলির মুখে ধ্বনিত হয় জালিয়ান-ওয়ালা বাগের নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত ভারতবাসীর প্রতিবাদ ধ্বনি।

তৃতীয় অধ্যায়

অগ্নিযুগে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি কেন অসম্ভব ছিল

অগ্নিযুগে বোমা তৈরির ব্যাপক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও দেশী পিস্তল, রিভলবার, বন্দুক বা পাইপগান প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টা হয় নি; কারণ এ সকল অস্ত্র তৈরির জন্য বিশ্বস্ত দক্ষ কারিগর এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ও উপকরণ সংগ্রহ এক প্রকার অসম্ভব ছিল। এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র পাকড়াশীর বিবরণ:

"গোপনে কেনা, চুরি করে সংগ্রহ করা অথবা ডাকাতিতে কেড়ে আনা ছাড়া বন্দুক পাওয়ার অন্য উপায় ছিল না। দেশী মিস্ত্রারা কেউ কেউ পিস্তল, রিভলবার ও বন্দুক নমুনা দেখে তৈরি করতেও পারত বটে, তবে সে সব বেশী কাজের হয় নি। মিস্ত্রীরা এমন দুঃসাহস করতও না।" (৫৯)

আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয়—রাজনৈতিক ডাকাতির মুখ্য উদ্দেশ্য

অগ্নেয়াস্ত্র ক্রয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহই ছিল রাজনৈতিক ডাকাতির মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয়ের টাকা সংগ্রহ এবং সংগৃহীত সামান্য অর্থদ্বারা অস্ত্রক্রয়ের বিপুল অর্থের চাহিদা মেটানো অসম্ভব বলেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিপ্লবীদের ডাকাতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছে। অনেক ডাকাতির উদ্দেশ্য ছিল শুধু অর্থ সংগ্রহ নয়, অস্ত্র সংগ্রহ; লক্ষ্যটা বেশী থাকত গৃহস্বামীর অর্থ ভাণ্ডারের চেয়ে অস্ত্র ভাণ্ডারের দিকে; সুযোগ পেলে গৃহস্বামীর বন্দুকটিই তাঁরা আগে সংগ্রহ করতেন। কুসঙ্গল ডাকাতির উদ্দেশ্য ছিল একটি সরকারী বন্দুক অপহরণ। কলকাতায় গার্ডেনরীচ ট্যাক্সি ডাকাতি ও বেলেঘাটা চালপট্টিতে ডাকাতির উদ্দেশ্য ছিল জার্মান অস্ত্র আমদানি ব্যাপারের অর্থ সংগ্রহ। কাকোরী ট্রেন ডাকাতির উদ্দেশ্য ছিল কিছু জার্মান মাউজার পিস্তল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগহ।

এ সব ডাকাতির ক্ষেত্রে সাধারণতঃ রিভলবার, পিস্তল এবং ১২ বোরের একনলা ও দোনলা বন্দুক ব্যবহৃত হয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শক্তিশালী রাইফেল ব্যবহৃত হয়েছে। ভয় দেখানোর জন্য ক্ষেত্র বিশেষে সাধারণ পটকা ব্যবহৃত হলেও বোমা ব্যবহারের নজির প্রায় দেখা যায় না।

আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ প্রচেষ্টা

অগ্নিযুগের প্রথমদিকে চন্দননগর ছিল বাঙ্গালী বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের প্রধান কর্মকেন্দ্র ; কারণ ফরাসী উপনিবেশ বলে সেখানে ব্রিটিশ ভারতের ন্যায় ততটা কড়াকড়ি না থাকায় সেখান থেকে অস্ত্রসংগ্রহ করা দুষ্কর ছিলনা।

গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে বিপ্লবীরা কিশোরমোহন সাপুইর মাধ্যমে চন্দননগরের ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করা বিদেশী রিভলবার, পিস্তল প্রভৃতি সংগ্রহ করতেন। শ্রীঅমল কুমার মিত্রের মতে—"চন্দননগরের কিশোরীমোহন সাপুই ফ্রান্স থেকে নিয়মিত রিভলবার আমদানী করতেন। এঁর কাছ থেকে মানিকতলা বাগানের জন্য বারীন্দ্রকুমার ঘোষ রিভলবার কিনতেন। ব্রিটিশ পুলিস খবর পায় ; চন্দননগর থেকে রিভলবার ব্রিটিশ ভারতে চালান হচ্ছে। তারা ফরাসী কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তি করে চন্দননগরে অস্ত্র আইন পাস করিয়ে নেন; কিশোরী মোহন প্যারিস থেকে ৩৮টি পার্শ্বেল আনিয়েছিলেন। ২২টি পার্শ্বেল নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। অবশিষ্ট ১৬টি পার্শ্বেল ফরাসী কালেকটারীতে খুলে দেখা যায় সব গুলোতেই রিভলবার ভর্তি। ইতিমধ্যেই কিন্তু বাংলার বিপ্লব সমিতিতে চন্দননগরের রিভলবার ছড়িয়ে গেছে।" (৬০)

আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ বিষয়ে মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর বিবরণ : "স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিকে চন্দননগরে অস্ত্র আইন ছিল না, সেখান হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করা সহজ ছিল, অবশ্য পরে তাহা বন্ধ

হইয়া যায়। ফিরিঙ্গীদিগের নিকট হইতে কিছু অস্ত্র সংগ্রহ হইয়াছে। বিপ্লবীদিগের বন্দুক, পিস্তল আমদানি হইয়াছে বিদেশ হইতে, বিদেশগামী জাহাজের মারফত। দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতেও কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। আবার দেশেও বন্দুক পিস্তল তৈয়ারের চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই।

তখন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটদিগের বন্দুক পিস্তল ক্রয় করিবার লাইসেন্সের প্রয়োজন হইত না, তাঁহারা বিনা লাইসেন্সেই ক্রয় করিতে পারিতেন। আমাদের কাপাসাটিয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার রায় অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সে ১৯১০ সনের কথা, আমি তখন পলাতক ছিলাম। কৃষ্ণকুমার রায় অনারারী মাজিস্ট্রেটের নামে কলিকাতার এক বন্দুক বিক্রেতা সাহেব কোম্পানির ঠিকানায় একটি মশার পিস্তল ও দুইশত কার্তুজের অর্ডার গেল। ঠিকানা দেওয়া হইল ঢাকার একটি বাসার। ঐ ঠিকানায় মাল পাঠানোর সংবাদ আসিল। মাল আনিতে হইবে সদর পোস্টআফিস হইতে, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের নিজের। আমাদের একজন সভ্য আড়াই হাজারের জনৈক জমিদার পুত্র ধীরেন্দ্র চৌধুরী অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণকুমার রায় সাজিয়া একখানা ভাল ঘোড়ার গাড়িতে মাল খালাসের জন্য সদর পোস্ট আফিসে গেলেন। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলি দূর হইতে গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন কোন গুপ্তচর পেছন লইয়াছে কি না। ধীরেন্দ্র চৌধুরী অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট "কৃষ্ণকুমার রায়" নাম দস্তখত করিয়া নিরাপদে মাল লইয়া আসিল, মাল সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদ স্থানে চলিয়া গেল। ইহার পর যখন পিস্তলের অনুসন্ধান হইল, তখন পুলিস জানিল কৃষ্ণকুমার রায় ইহার কিছুই জানেন না, নাম দস্তখতও তাঁহার নয়। পুলিস বুঝিয়া ফেলিল ইহা ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যাদিগের কাণ্ড। তখন মশার পিস্তল ও কার্তুজের সন্ধানে বহু বাড়ি তল্লাসী হইল কিন্তু মশার পিস্তল বা কার্তুজের কোন

সন্ধান পাইল না। এরূপভাবেও কিছু পিস্তল আমাদের হস্তগত হইয়াছে।” (৬১)

শ্রদ্ধেয় প্রতুল গাঙ্গুলির বিবরণ: “চট্টগ্রাম থেকে সমিতির কিছু লোক বর্মায় গেল এবং কাঠের কারবারের উপলক্ষ্যে আরাকান সীমান্তে এবং ভিতরেও গেল। খোঁজখবর সুরু হল চট্টগ্রাম থেকে জাহাজে গোপনে বিদেশে লোক পাঠান যায় কিনা; আকিয়াব ও তার চাইতেও দূরে লোক যাতায়াত করে সাম্পান যোগে ধানের ব্যবসা উপলক্ষ্যে—এ সুযোগ আমরা কি ভাবে কাজে লাগাতে পারি। ভবিষ্যতে কোন বিদেশী শক্তি আমাদের সাহায্য করতে স্বীকৃত হওয়ার ফলে যদি জাহাজ যোগে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসা যায় তবে সেগুলি সাম্পানে নামিয়ে চাল বোঝাই নৌকা বলে বন্দরেও হয়ত নিয়ে আসা যেতে পারে।” (৬২)

রডা কোম্পানির মাউজার পিস্তল অপসারণ আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের এক দুঃসাহসিক সফল প্রয়াস। অস্ত্রসংগ্রহে খ্যাত অখ্যাত বহু কর্মীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান আছে।

জানা যায় যতীন মুখার্জি চেতলার জনৈক চারু ঘোষের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের নূরখাঁন নামক জনৈক আগ্নেয়াস্ত্রের গোপন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে রিভলবার কিনতেন। নিরাপত্তার খাতিরে অনেক সময় সরাসরি অস্ত্র না কিনে বিশ্বস্ত কারও মাধ্যমে কেনা হোত। বিপ্লবীরা অস্ত্র সংগ্রহ করতেন প্রধানতঃ দু-টি উপায়ে: এক. ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে; দুই. অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, চীনাম্যান, ইতালীয় ও অন্যান্য বিদেশী নাবিক খালাসিদের কাছ থেকে দাম দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয় করে। (৬৩)

তখন সারেংপাড়া, খিদিরপুরের জাহাজঘাটা প্রভৃতি অঞ্চল ছিল রিভলবার, পিস্তল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলিবারুদ ক্রয়বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র। এ সকল স্থানে সাধারণতঃ বিশ্বস্ত দালালের মাধ্যমে বিদেশী নাবিক ও খালাসিদের সাথে যোগাযোগ করা হোত।

অপহরণ ও ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্রসংগ্রহের কয়েকটি ঘটনা ঃ

১৯০৯ সালের ১লা এপ্রিল কুমিল্লায় ঢাকার নবাবের তিনটি রাইফেল অপহৃত হয়।

যাজপুরের এস. ডি. ও. পূর্ণচন্দ্র মৌলিকের হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে অপহৃত ৬৬০৮ নং ওয়েবলি রিভলবারের গুলিতে সামসুল আলম নিহত হন। (৬৪)

১৯১১ সালের ২১ শে জুলাই ময়মনসিংহের গোলোকপুরের জমিদার গৃহ থেকে এগারোটি বন্দুক অপহৃত হয়।

১৯৩২ সালের ১৯শে জানুয়ারী ঢাকায় লোহার ডাণ্ডার আঘাতে আহত পুলিস সার্জেন্ট বোর্ণির পিস্তল ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

এ সকল ছোট খাটো প্রচেষ্টায় সামান্য আগ্নেয়াস্ত্র সংগৃহীত হোত। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপকতম প্রয়াস বলা যায়। বিপ্লবীরা নিজেদের এবং পরিচিত পাড়া প্রতিবেশীর গৃহ হতে যে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করতেন চট্টগ্রাম যুব অভ্যুত্থানকালে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের বাড়ির কিংবা পরিচিত পাড়া প্রতিবেশীর ১২ বোরের একনলা ও দোনলা বন্দুক সঙ্গে করে নিয়ে আসেন।

আগ্নেয়াস্ত্রের বিপুল চাহিদা মেটাবার জন্য বিপ্লবীরা শুধু দেশের ভেতর থেকেই অস্ত্র সংগ্রহ করেন না, বাইরে থেকেও উন্নত ধরনের অস্ত্রসংগ্রহের চেষ্টা করেন।

সর্দার সিং রাণা প্যারিস থেকে পঁচিশটি ব্রাউনিং পিস্তল সংগ্রহ করে লণ্ডনে বিনায়ক দামোদর সাভারকরের নিকট প্রেরণ করেন। এ সম্পর্কে ক্যাম্পবেল কের সাহেবের বিবরণ ঃ

The Browning Pistols

By enquiries in Paris it was ascertained that 25 Browning pistols, including the 20 mentioned above, were sold at the

end of January, 1909, by a M. Chobert, 16, rue, Lafayette to two natives of India who were brought to the shop by the notorious S. R. Rana. The pistols were delivered to the two purchasers at Rana's address, 45, rue Blanche." (৬৫)

এই পঁচিশটি ব্রাউনিং পিস্তলের মধ্যে চতুর্ভুজ আমিনের মাধ্যমে কুড়িটি ভারতে পাঠানো হয়। এই পিস্তলগুলো নিয়ে চতুর্ভুজ আমিন ১৯০৯ সালের ৬ই মার্চ নিরাপদে বোম্বে পৌঁছে। পরে সে ধরা পড়ে রাজসাক্ষী হয়। নাসিক ষড়যন্ত্র মামলায় তার বিবৃতি থেকে জানা যায় যে সাভারকর প্রেরিত এই ব্রাউনিং পিস্তলের সাহায্যে জ্যাকসন নিহত হয়। জানা যায় যে ব্রাউনিং পিস্তল ছাড়াও সাভারকর একটি কোল্ট রিভলবার ও একটি বেলজিয়ান অটোমেটিক পিস্তল সংগ্রহ করে মদনলাল ধিংড়াকে দেন।

লণ্ডন, প্যারিস প্রভৃতি ইউরোপের বড় বড় অনেক শহরে এক ধরনের নাম করা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান অর্থের বিনিময়ে তাদের বাণিজ্যিক দ্রব্যের পার্শেলের ভিতর রিভলবার, পিস্তল প্রভৃতি ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র ভারতে প্রেরণ করত। পুলিস এসব নামী প্রতিষ্ঠানের পার্শেল না খোলায় বিপ্লবীরা পূর্ব প্রেরিত সংবাদ অনুসারে নিরাপদে এই সকল পার্শেলের ডেলিভারি নিতেন।

১৯১২ সালে জার্মান যুবরাজের কলকাতা আগমন কালে যতীন মুখার্জি এবং নরেন্দ্র ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্র নাথ রায়) এক গোপন বৈঠকে তাঁর সাথে মিলিত হন। এ সম্পর্কে নিক্সন রিপোর্টের তথ্য :

"It has been alleged that during the visit of the crown Prince of Germany to Calcutta in 1912, Narendra Bhattacharji, and Jatin Mukherjee had an interview with him and that he had given them an assurance that arms and ammunition would be supplied to them." (৬৬)

অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য ভারতীয় বিপ্লবীরা ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের সাহায্য প্রার্থী হন। এ সম্পর্কে নিক্সন রিপোর্টের বিবরণ :

"The Chinese revolution and the personality of Dr. San Yet Sen seem to have inspired young India during 1913, and there are various points of evidence to show that Sun Yet Sen was approached for help on behalf of the Indian aspirants to liberty." (৬৭)

সান ইয়াৎ সেনের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ সম্পর্কে এর বেশী তথ্য জানা যায় নি, তবে কলকাতার চীনাম্যানদের সাথে বিপ্লবীদের যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল নিক্সন রিপোর্ট থেকে জানা যায়। নিক্সন রিপোর্টের মতে "Nevertheless, certain Chinamen had dealings with Bengalees in Calcutta in connection with the general conspiracy." (৬৮)

বাইরেথেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী বিষয়ে গদর দলের এক উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা ছিল। বজবজ সঙ্ঘর্ষে ব্যবহৃত আমেরিকান পিস্তল ও রিভলবার এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১৯১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুশীলন সমিতি অস্ত্রসংগ্রহ, অস্ত্রনির্মাণ এবং বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরি শিক্ষা কল্পে কেদারেশ্বর গুহকে ইউরোপে প্রেরণ করেন। কেদারেশ্বর গুহের সাথে ম্যাডাম কামার আলোচনার পর কলকাতা কিংবা চন্দননগরে অস্ত্রাদি প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়। (৬৯)

সিডিসন কমিটির রিপোর্ট অনুসারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হলে ইউরোপ প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সাথে জার্মান কর্তৃপক্ষের আলোচনার পর (১) আফগান পরিকল্পনা, (২) ব্যাটাভিয়া পরিকল্পনা ও (৩) ব্যাঙ্কক পরিকল্পনা নামক তিনটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

আফগান পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল আফগান সরকারের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও সামরিক সাহায্য লাভ। এই উদ্দেশ্যে কাবুল মিশন প্রেরিত হয়। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও বরকতুল্লাহ্ এই মিশনের সদস্য ছিলেন। কাবুল মিশন আফগান সরকারের সহানুভূতি লাভ করলেও কার্যকরী কিছু করে উঠতে পারেন নি।

ব্যাটাভিয়া পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল অর্থ ও উন্নত ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করে বাঙ্গালী বিপ্লবীদের সাথে সংযোগ সাধন।

ব্যাঙ্কক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল গদর দলের সহায়তায় শ্যামদেশের মধ্য দিয়ে স্থলপথে ব্রহ্মদেশ হয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত পথে ভারত আক্রমণ।

জার্মান পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল সানফ্রান্সিস্কোর ভারতীয় প্রবাসী বিপ্লবীদলের এবং ভারতের বিপ্লবীদের দ্বারা ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানো। সাংহাই-এর জার্মান বাণিজ্যদূতের উপর "সুদূর প্রাচ্য পরিকল্পনার" রূপায়ণের ভার অর্পিত হয়। ব্যাঙ্কক ও ব্যাটাভিয়া এই পরিকল্পনা রূপায়ণের কর্মকেন্দ্র ও ভারতীয় বিপ্লবীদের ব্যাপক অস্ত্র সরবরাহ কেন্দ্রে পরিণত হয়। (৭০)

জার্মান অস্ত্রবাহী জাহাজ সংক্রান্ত তথ্য

জার্মান কর্তৃপক্ষ এস. এস. ম্যাভেরিক নামক তৈলবাহী জাহাজে বাঙ্গলার বিপ্লবীদের জন্য তেত্রিশ হাজার রাইফেল ও প্রত্যেকটি রাইফেলের জন্য চারশ গুলি এবং দু-লাখ টাকা প্রেরণের সিদ্ধান্ত করেন; স্থির হয় যে বঙ্গোপসাগরে এসে সঙ্কেত প্রদর্শনমাত্র রায়মঙ্গল নদের মোহনায় অপেক্ষাকারী বিপ্লবীরা ম্যাভেরিক জাহাজের অস্ত্রশস্ত্র ডেলিভারি নিয়ে ওগুলি নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবেন। উড়িষ্যার উপকূলেও কিছু অস্ত্র নামিয়ে দেবার সিদ্ধান্তও হয়; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ম্যাভেরিক অস্ত্র নিয়ে পৌঁছতে পারে নি। ব্যাপারটা হোল এই যে, মেসার্স এফ্‌ জেবসন এণ্ড কোং নামক এক জার্মান বাণিজ্য সংস্থা ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানির কাছ থেকে এস. এস. ম্যাভেরিক নামে এক তৈলবাহী জাহাজ কিনে তার খোল খালি করে ফেলে। তারপর ১৯১৫ সালের ২২শে এপ্রিল কালিফোর্নিয়ার সানপেড্রো বন্দর থেকে ম্যাভেরিক জাভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে নির্দেশ অনুসারে মেক্সিকোর ছ-শ মাইল পশ্চিমে নির্জন

সক্রোদ্বীপে অস্ত্রবাহী জাহাজ অ্যানি লারসেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। স্থির হয়েছিল যে অ্যানি লারসেন প্রেরিত অস্ত্রসম্ভার সক্রোদ্বীপে ম্যাভেরিকের শূন্য খোলের মধ্যে নামিয়ে দিলে তেল ভরে নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর হয়ে ম্যাভেরিক বঙ্গোপসাগরের দিকে রওনা হবে। জার্মান কর্তৃপক্ষের নির্দেশে হের টাউশ্চের নামক নিউইয়র্ক নিবাসী জনৈক জার্মান ভদ্রলোকের মাধ্যমে অস্ত্রগুলো মেক্সিকো থেকে ক্রয় করা হয়।

ব্রিটিশ রণতরী কেন্ট ও রেইনবো সন্দেহক্রমে সক্রোদ্বীপে ম্যাভেরিক জাহাজ তল্লাসী করে আপত্তিকর কিছু না পেয়ে চলে যায়।

আমেরিকান কর্তৃপক্ষ অস্ত্রশস্ত্র সহ অ্যানি লারসেনকে ওয়াশিংটনে আটক করেন, জার্মান রাজদূতের প্রতিবাদ সত্ত্বেও আটক অস্ত্রশস্ত্র ফেরৎ দেওয়া হল না। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে অ্যানি লারসেনের জন্য প্রতীক্ষা করে জার্মান কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ম্যাভেরিক অবশেষে অস্ত্রসম্ভার না নিয়েই জাভা অভিমুখে যাত্রা করল। জাভা পেঁাছামাত্র ডাচ্ কর্তৃপক্ষ ম্যাভেরিক জাহাজ তল্লাসী করে কোনও অস্ত্রশস্ত্র না পেলেও বঙ্গোপসাগর অভিমুখে যাত্রার অনুমতি দিল না; ম্যাভেরিক ফিরে গেল মেক্সিকোতে।

এরপর হেনরি এস নামক জাহাজে ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য পাঁচহাজার পিস্তল এবং একলক্ষ টাকা পাঠানোর পরিকল্পনা হয়। স্থির হয় ব্যাঙ্ককে পাঁচশ পিস্তল নামিয়ে দিয়ে বাকী সাড়ে চারহাজার পিস্তল চট্টগ্রামে নামিয়ে দেওয়া হবে। আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শেখানোর জন্য উইদি ও জর্জ পল বোহেম নামে দু-জন জার্মানকে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়; কিন্তু ম্যানিলাতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ জাহাজ তল্লাসী করে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আটক করল, ফলে এবারের চেষ্টাও ব্যর্থ হোল।

ম্যাভেরিকে অস্ত্র প্রেরণ ছিল ব্যাটাভিয়া পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত আর হেনরি এস জাহাজে অস্ত্র প্রেরণ ছিল ব্যাঙ্কক পরিকল্পনার
—।

ভারতে জার্মান অস্ত্র প্রেরণ সম্পর্কে নিম্নন রিপোর্ট :

"During the early months of 1915 various hints and rumours were afloat of a combination between the revolutionaries in India and German agents. On 11th July, 1915 it was reported that a certain Indian in close touch with the German Secret Service in Berlin had inadvertently communicated information which had been passed on to the Govt. of India. That a cargo of 17,000 rifles destined for India had already arrived at Sumatra and that they were to be sent from that place in small consignments to India. This stock was said to be purchased in the U. S. and despatched via South-America to Sumatra." (৭১)

এই রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে :

"It had been known from some time that the Ghadr Party in America had been receiving arms and ammunitions from the Germans and it was also a suspicious circumstance that the Hamburg-American steamer S. S. Bayern which left Hamburg for a "Far Eastern Post" in July, 1914 and was later interned at Naples was found to contain vast quantities of rifles, revolvers., ammunitions and other war stores." (৭২)

এ ছাড়া আর একখানি জার্মান অস্ত্রবাহী জাহাজ বঙ্গোপসাগরে আসে ; খবর পেয়ে ব্রিটিশ ক্রুজার "কর্নওয়াল" কামান দেগে আন্দামানের অদূরে জাহাজটি ডুবিয়ে দেয়।

মহানায়ক রাসবিহারী সাংহাইতে ৩২নং ইয়াংসিপু রোডে নীলসন নামক জনৈক জার্মানের গৃহে অবস্থান কালে দু-জন চীনাম্যানের মাধ্যমে কলকাতায় অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির শ্রমজীবী সমবায়ের ঠিকানায় ১২৯টি পিস্তল, ১২০০০ রাউণ্ড গুলি ও টাকা পাঠান। এই আগ্নেয়াস্ত্র ও টাকা যথাস্থানে পৌঁছতে পারে নি।

রাসবিহারীর সাথে ঢাকা অনুশীলন সমিতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও তাঁর মাধ্যমে জাপান থেকে অস্ত্রসংগ্রহ প্রচেষ্টা সম্পর্কে নিম্নন রিপোর্টে আলোকসম্পাত করা হয়েছে :

...It seems that the Dacca Anusilan Samiti had been in touch with Japan through Rash Behari Bose for some time and this Society certainly expected to get arms from that country and had apparently provided large sums of money for that purpose." (৭৩)

উপসংহার

অগ্নিযুগের আগ্নেয়াস্ত্র মারণাস্ত্র নয়; দাসত্ব-লাঞ্ছিত মানুষের বেদনার বজ্র নির্ঘোষ;—বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। যখনই বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে বা রিভলবার, পিস্তল গর্জে উঠেছে তখনই শঙ্কিত শাসক শক্তি শাসন সংস্কারে প্রয়াসী হয়েছে। তাই ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অগ্নিযুগের আগ্নেয়াস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

নির্দেশিকা

(১) শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ) : জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পৃঃ-৪৫ ।

(২) ঐ ঐ পৃঃ-৪৩ ।

(৩) Biplabi Mahanayak Rashbehari Basu Smarak Society : Rashbehari Basu—His Struggle for India's Independence. Page 23-24.

(৪) Shri Saral K. Chatterjee : Anushilan Samiti as a Revolutionary Party : Freedom Struggle and Anushilan Samiti Vol.1, p. 63.

(৫) Sedition Committee Report and Nixon Report : on Cocoanut type bombs.

(৬) শ্রীজীবনতারা হালদার : অনুশীলন বার্তায় প্রকাশিত প্রবন্ধ : 'স্মৃতি থেকে অনুশীলন সমিতির সূচনা দিনে' ।

(৭) শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত : দেশ যাঁদের ভোলেনি (১) পৃঃ ৩১ ।

(৮) শ্রীমতিলাল রায় : আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী ।

(৯) শ্রীঅমলকুমার মিত্র : বিপ্লব সহযাত্রী চন্দননগর ।

(১০) Nixon Report. Part I, Chapter V.

(১১) Sedition Committee Report.

(১২) Benaras Conspiracy case Judgement.

(১৩) শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত : বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা পৃঃ ৬২ ।

(১৪) শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : ভারতের বিপ্লব কাহিনী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৪ ।

(১৫) Alipore Bomb Case Judgement.

(১৬) Ibid.

(১৭) Prof. Uma Mukherjee : The Two Great Indian Revolutionaries p. 22.

(১৮) Nixon Report part I.

(১৯) The Session Court Judgement of Muzzafferpore Bomb case.

(২০) Ibid.